সূচী

দু কথা—

বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের মনে প্রতিবেশী সাহিত্য পড়ার আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়েছে অন্ধ্র বা তেলুগু ভাষায়। তেলুগু ভাষা থেকে আমার অনূদিত অগ্নিকন্যা, সুরের সানাই বাজুক, কাভম, একটি প্রেমের কাহিনী, ঘ্যাড়ি-পালিয়ে প্রভৃতি উপন্যাস ও অন্ধ্রের গল্পগুচ্ছ গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। সম্প্রতি আমার অনূদিত ও সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত নারায়ণ রাও উপন্যাসটির সম্বন্ধে আনন্দবাজারের সমালোচকের মন্তব্য: অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য' এর সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসটির নানা আপাত ও আন্তরিক সাদৃশ্য চোখে পড়ে।.... এমন স্বচ্ছন্দ বাংলায় অনুবাদ যে ...নামধামগুলো পাল্টে দিলে এটা খাঁটি বাংলা উপন্যাস হয়ে যাবে।

'এখন যে হাওয়া বইছে' গ্রন্থে তেলুগু সাহিত্যের বিপ্লবী কর্মীদের লেখা তেরটি গল্পের অনুবাদ স্থান পেয়েছে। এই গল্পগুলি বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে রচিত হওয়ায় প্রতিটি গল্পে একালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের রূপ প্রকটভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এতে জীবনের ঘটনা ও প্রয়োজনের কথা ঠিক ঠিকভাবে লেখা হয়েছে এবং সেইজন্যই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই গল্প সংকলন বাঙালী পাঠক পাঠিকাদের কাছে ভালো লাগবে।

'এখন যে হাওয়া বইছে' গ্রন্থে কয়েকটি গল্প নন্দন, অনুষ্টুপ, সত্যযুগ, মাসিক বাঙলাদেশ, নিরীক্ষণ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাগুলির সম্পাদকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

বর্তমান গ্রন্থটির প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য পেয়েছি শ্রী কৃষ্ণানন্দ দাসের কাছ থেকে। প্রচ্ছদলিপি এঁকেছেন শ্রী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

অমর

চেরবণ্ডরাজু

এ এক মারাত্মক পথ। এ পথে গাড়ি চালানোর বিপদ আছে। সব সময় হাতে স্টিয়ারিং ধরে রাখতে হয়। বুক দুরু দুরু করে। যেখানে সেখানে গর্ত। উঁচু নিচু। চৈত্রে যেমন ধুলোর দাপট, বর্ষায় তেমনি কাদা। গর্তে পড়লেই আর রক্ষে নেই। এই পথ সম্পর্কে ড্রাইভার খাসিং-এর তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে।

ঐ পথ। শীতের পথঘাট ঢেকে গেছে। বারবার সামনের কাঁচটা মুছতে হচ্ছে। জীপের গতি যত বাড়ে শীত বাড়ে তার শত গুণ। তার ওপর আছে ভয়। পথের ভয়। দুর্ঘটনার ভয়। ভীষণ খিদে পাচ্ছিল। ক্ষুধা, ভয়, শীত এই তিনটি যেন প্রতিযোগিতা করছে। কার ক্ষমতা কত বেশি। আর এই তিনটেকেই ছুঁয়ে যাচ্ছে পেট্রলের গন্ধ।

শুধু কি তাই। পাশেই ডি. এস. পি. রেড্ডি। বিরাট বিরাট গোঁফ। বুড়ো আঙুলের চেয়ে মোটা চুরুট মুখে পুরে সমানে টেনে যাচ্ছে। পেট্রলের গন্ধ আর চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধে বমি আসার উপক্রম হচ্ছিল। অন্ধকার ভেদ করে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

ডি. এস. পি. রেড্ডির পাশে একটি ছেলে। বয়স চোদ্দ বছর। গায়ে একটি হাওয়াই সার্ট। পরনে একটু ছেঁড়া প্যান্ট। তার মুখে কোন ভয়ের ছাপ নেই। ঠোঁট দেখে মনে হয় সে হাসিমুখে কোন গানের কলি ভাঁজছে। তার পেছনে, তার পিঠের ওপর তাক করে মেসিনগান ধরে রয়েছে ইন্‌স্‌পেক্টর। ছুটো বড় বড় পাথরের টুকরোর মাঝখানে যেন একমুঠো কচি ঘাসের মত ছেলেটিকে দেখাচ্ছিল। তার নাম রামবাবু। পিঠে যেভাবে মেসিনগান ধরে রয়েছে তা দেখে কিছুক্ষণ অন্তর রামবাবুর হাসি পাচ্ছিল। কি ভেবে সে বলল, 'এই জায়গাটা একেবারে ফাঁকা মাঠ। এখানে ভয়ের কিছু নেই। মেসিনগান পাশে রেখে দিতে পারেন।'

'চুপ কর্ হারামজাদা !' গর্জে উঠল মেসিনগান ধরা শিবলিঙ্গম্।

এ ছাড়া ঐ জীপে আরও দুজন পুলিশ ছিল, তাদের প্রত্যেকের হাতে বন্দুক। আর তাদের প্রত্যেকের প্রাণে ভয়ও ছিল। যার ভয়ে তারা মরছে। প্রত্যেকেই কাঁপছিল। বোঝা যাচ্ছিল না ওরা শীতে কাঁপছে না ভয়ে। প্রত্যেকেই চেষ্টা করছিল একটু সরে সরে বসতে। নিজেকে আলাদাভাবে রাখতে। ভাবটা যেন এই—হঠাৎ একটা গুলি এসে তাদের তিন জনকেই যেন না বিদ্ধ করে।

দু-এক মাইল অন্তর এক একটি বাড়ি। দু চারজন কৃষককে ঐ বাড়ির সামনে দেখতে পাচ্ছিল। যতবার কৃষকদের দেখেছে ওরা ততবারই টিগারের ওপর আঙুল রেখেছে। আর কারো হাতে লাঠি বা অস্ত্র কিছু দেখতে পেলে তো কথাই নেই। জীপের শব্দ শুনেই বাচ্চা মেয়ে বুড়ো সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখছিল। জীপটা হঠাৎ এক পথচারীর সামনে পড়ে গেল। সে প্রচণ্ড রোদে সূর্য দেখার মতো কপালে হাত রেখে জীপের দিকে তাকাল। জীপটা তখনও এক ফার্লং দূরে ছিল। পথচারী পথের এক ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ আপন মনে, 'এত জীপ' বলে সে আবার হাঁটতে লাগল। জীপটা কাছাকাছি আসতেই ডি. এস. পি. রেড্ডির নির্দেশে হঠাৎ জীপের গতি বেড়ে গেল। জীপের তীব্র গতি দেখে পথচারী একটু অবাক হল।

ঐ জায়গাটা ছিল একটি নামকরা গ্রাম। দু তিনটে টালির বাড়ি ছিল সে গ্রামে। বাকি সব পাতা আর খড়ের ছাউনির ঘর। দুপুরবেলা ধুলোয় সমস্ত পথ ধোঁয়ায় ভরে যাওয়ার মতো হয়েছে। জীপ যে পথের ওপর দিয়ে যাচ্ছে সে পথের মানুষ ধুলোর অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্ছে না। আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে খাসিং শীতকালেও ঘেমে নেয়ে উঠেছে। অত ধুলোতে যতই গাড়ির গতি বাড়াক না কেন ডি. এস. পি. যত স্পীড চায় তত হয় না। গতি কমে গেলে ডি. এস. পি. ড্রাইভার খাসিং-এর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। হঠাৎ এক মোড়ের মাথায় 'ঐ তো, ঐ তো রামবাবু' বলে কিছু লোকের গলা শোনা গেল।

শুনে ডি. এস. পি. চমকে উঠলো। দেখতে পেল কতকগুলো ছেলে চেঁচাচ্ছে। ওদের ডাকের জবাবে রামবাবু হাত নাড়ল। দেখতে পেয়ে ছেলেরাও হাত নাড়ল।

তারপর সামনে বসা দুজন ইনস্পেক্টর নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলে রামবাবুকে জীপের পেছনের দিকে, যেখানে ছ জন পুলিশ বসেছিল, সেখানে পাঠিয়ে দিল।

'অত ভয় পাচ্ছেন কেন স্যার?' বলতে বলতে রামবাবু জীপের পেছনে চলে গেল।

'ছেলেটার চাউনি যেন বর্শার ফলা।'

'ছেলেটার চোখে ঝক্‌ঝকে তারা আছে।'

'সত্যি সুন্দর চোখ।'

'ব্যাটার সবে গোঁফের রেখা উঠেছে।'

'একেবারে আমার ছেলেটির মতো দেখতে।'

'এইটুকু ছোকরা আবার দলে আছে, ভাবতে কেমন লাগে। এর তো গাল টিপলে দুধ বেরয়। দলে করে কি?'

'আমাদের যে খতম করতে আসে তার বয়স আমরা দেখি না। বাপু হে, শত্রুকে শত্রু হিসেবে দেখতে ভুলো না।'

'আমার ছেলেটা একেবারে বখে গেছে। তার চেয়ে এদের দলে ভিড়ে গেলে ভালো হত।' পুলিশের মধ্যে যার যা মুখে আসছে সে তাই বলছে। ওরা সবাই জানে, যে চাকরি ওরা করছে তাতে তাদের স্বাধীনতা কত টুকু। এমন কি কথা বলারও ওদের একটি সীমা আছে। সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলে ওদের চাকরিতে টান পড়ে। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। ওদের পথে বসানোর অনেক ধারা আছে।

রামবাবু এক এক করে প্রত্যেকটার দিকে তাকাচ্ছিল।

'পুলিশগুলোর একটার শরীরেও কি এক কিলো করে মাংস আছে? চোখে ঘুম যেন ভরে রয়েছে। এক এক জন কত রাত ঘুমায় নি কে জানে? চোখগুলো দেখে মনে হয় ভেতর থেকে কেউ টানছে। আহা,

হাতের কি অবস্থা। যেন বাঁশের টুকরো। আর সেই হাতেই ধরে রয়েছে বন্দুক। এক একটা শিরা কিরকম ফুলে ফুলে উঠেছে। কারো মুখেই উজ্জ্বলতা বলতে কিছুই নেই। ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে ভাবতে ভাবতে রামবাবুর চোখে জল এল। ঐ অবস্থাতেই সে ওদের জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশে কি সবাই গরিব ?' রামবাবু ওদের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে বলল, যেন সে ঘন অন্ধকারে ওদের সামনে একটু আলো ধরছে ; যেন সে ক্ষুধার্ত পুলিশদের খেতে ডাকছে। সেই মুহূর্তে পুলিশ-দের মনে হল ওদের জন্য হাজার হাজার মানুষ ভেবে দুঃখ পাচ্ছে। পুলিশদের মধ্যে রামমূর্তি ছোট্ট ধমক দিয়ে বলল, 'এই রামবাবু!' ধমকটা এমন ভাবে দিল যেন নিজের ছেলে ছোট-খাটো দোষ করে ফেলেছে, তারই জন্য সে বকছে।

'কি হচ্ছে কি ?' সামনে থেকে একটা গর্জন শোনা গেল। 'এত কথা কিসের ?' সামনে থেকে অন্য এক কণ্ঠস্বর।

পুলিশদের মধ্যে একজন রামবাবুর মুখ চাপা দিল।

আসলে রামবাবুর কথা শুনতে পুলিশদের ভাল লাগছিল। ওরা রামবাবুর দিকে যে দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল সে দৃষ্টি হল করুণার, দয়ার।

রামমূর্তি রামবাবুর স্বর, তার আচার-আচরণ এবং তার বুদ্ধি সম্পর্কে ভালভাবেই জানে। আজ পর্যন্ত, পুলিশজীবনে রামমূর্তি রামবাবুর মতো ছেলেকে দেখে নি। শুধু দেখা নয়, অমন ছেলের কথা শোনেও নি। ছেলেটি সাহিত্যের খবর রাখে। কে কোন্ গান ভাল গায় তাও বলতে পারে। কোন্ পার্টি কি বলে, আর কি করে তাও সে জানে। সাধারণ জ্ঞান বলতে যা বোঝায়, যা অনেক বড়দেরও থাকে না, তা রামবাবুর ছিল। রামবাবুকে যে একবার দেখে, যে একবার তার কণ্ঠস্বর শোনে সে আর তাকে ভুলতে পারে না। তিন বছর আগে বিজয়ওয়াডায় গভর্নরপেটা সেন্টারে ডিউটি দেবার সময় রামবাবু যে বুদ্বুরা কথা শুনিয়েছিল রামমূর্তি আজও তা ভুলতে পারে নি।

আজও তার কানে সেই বুদ্বুরা কথা বাজতে থাকে। হরিণ শাবকের

মতো তাম্বুরা হাতে নিয়ে রামবাবু সেদিন যেভাবে নেচে নেচে অভিনয় করতে করতে বুদ্ধা কথা শুনিয়েছিল তা সে ভুলতে পারে নি। তার নাচ এবং অভিনয় দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন পারার মতো উজ্জ্বল এবং চঞ্চল। কি উজ্জ্বল হাসি ছিল তার চোখে-মুখে। মুখের ভাষা আর চোখের ভাষা এক হয়ে গিয়েছিল।

এখন রামমূর্তির ভীষণ ইচ্ছে করল রামবাবুর গান শোনার। মনে মনে ভাবল, 'একবার ব্যাটার ছেলেকে দিয়ে গাওয়াতে পারলে হত।'

রামমূর্তির আবার মনে পড়ল নিজের ছেলের কথা। ছেলেটা কোন কাজের হল না। স্কুলে যায় না। মা মারা যাওয়ার পর থেকে ছেলেটা একেবারে পথের ছেলে হয়ে গেল। আর বিয়ে করতে ইচ্ছে করল না রামমূর্তির। বিয়ে করে কি হবে। করে তো দেখল। একা বউ ঘরে থাকত, রাতের পর রাত ডিউটিতে বেরিয়ে যেতে হত। বউ অসুখে পড়লে, ডাক্তার ডাকার, ওষুধ কেনার টাকা থাকত না। বউ অসুখে পড়লেও একা তাকে ঘরে ফেলে রেখে ডিউটিতে যেতে হত। কারণ যখন তার দরকার পড়ত তখন সে ছুটি পেত না। অসুখে ভুগতে ভুগতে চরম মানসিক অশান্তিতে একদিন সে মারাই গেল। বউটা মরে বাঁচল। ছেলেটা বাঁচার পথ পায় নি। বেছে নিতেও পারে নি বাঁচার পথ। ফলে তাকে একদিন বেঘোরে মরতে হবে। এই অবস্থায় আবার বিয়ে করে আর একটি মেয়ের সর্বনাশ করার কি দরকার। রামমূর্তি এই সব কথা ভেবে নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দেয়। আবার তার কিছুক্ষণ পরেই মনে পড়ে বউয়ের কথা। বউটা অদ্ভুত ধরণের ছিল। পুলিশের চাকরি নাকি রাক্ষস আর শয়তান তৈরির চাকরি। যখন তখন পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিতে বলত। পুলিশের চাকরির চেয়ে নাকি রিক্সা টানার কাজ অনেক ভাল। কিন্তু তার রিক্সা টানার কাজ ভাল লাগত না।

চাকরি জীবনে, স্ট্রাইকের সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও, রামমূর্তি শ্রমিকদের ঠেঙিয়েছে, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়েছে, ছাত্রদের ওপর গুলি চালিয়েছে। এই সব করতে করতে তার মনটাও কঠোর হয়েছে। এ সবই সে করেছে,

আরও বহু পুলিশের মতো, চাকরির স্বার্থে, ইচ্ছে থাক বা না থাক। বলদের মতো তাদের কাজ করতে হয়েছে। সবই তাকে করতে হয়েছে পুতুলের মতো। বিশ্বাস করতে হয়েছে যে তাকে যা কিছু করতে হচ্ছে সবই দেশের স্বার্থে। সব কথা যে বিশ্বাস হয়েছে তা নয়। কারণ ওদের প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করলে মনে হয় দেশের সবচেয়ে বড় দেশপ্রেমিক পুলিশ। দেশের অন্য সব দেশপ্রেমিকদের স্থান পুলিশদের পরে। অথচ সে নিজে বুঝেছে, দেখেছে যে সমাজে পুলিশের তেমন মর্যাদা নেই। ডি. এস. পি. রেড্ডির দুটো চেহারাই সে দেখেছে। তার মতো মিথ্যাবাদী, নিষ্ঠুর, ব্যাভিচারী খুব কম আছে। কিন্তু তার খোলসটা অন্য ধরণের। তার কথায় ভুলতেই হবে। এমন সুন্দর ভাবে মিথ্যাকে সত্য করে বোঝাবে যে তা বিশ্বাস করতেই হবে।

রামমূর্তির একবার ইচ্ছে করেছিল নিজের বন্দুকের গুলি দিয়ে নিজেকে শেষ করে ফেলতে। পলাতক বন্দীর মতো তারও ইচ্ছে করেছিল চাকরি ছেড়ে পালিয়ে যেতে।

যখন তখন একটা না একটা সমস্যায় পড়তেই হত তাকে। এমন এক চাকরি যে শরীরের যখন বিশ্রাম দরকার তখন সে বিশ্রাম নিতে পারবে না। শ্রীকাকুলমে ডিউটিতে আসার পর সে বুঝতে পারল যে জীবন মানেই সংগ্রাম। এত গভীর ভাবে উপলব্ধি আগে তার হয় নি। শ্রীকাকুলমেই আত্মরক্ষার নামে তাকে যা করতে হয়েছে, ওপরের নির্দেশে, যত লোকের ওপর অত্যাচার করতে হয়েছে, যত লোককে গুলি করতে হয়েছে তেমনটি আর তার জীবনে কখনও হয় নি। শ্রীকাকুলমের স্মৃতি তাকে সারা জীবন পীড়ন করবে। সে আপন মনে ভাবে, ইনস্পেক্টররা ঠিকই বলে, 'পুলিশ হল বলদ। ওরা মানুষ নয়। আবার যে সে বলদ নয়। কলুর বলদ।' রামমূর্তি টানা অনেক ক্ষণ এসব ভাবতে ভাবতে আপন মনে বলে ওঠে, 'ভগবান আর কতদিন যে এইভাবে কাটাতে হবে কে জানে?' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রামমূর্তি।

রামবাবুকে দেখে রামমূর্তীর মনে আরও কত যে প্রশ্ন জেগেছিল তা

বলার নয়। তার দেহটা মাঝে মাঝে যেন শব হয়ে যায়। কিন্তু ছেলের কথা ভেবে সে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।

ঠিকই বলেছ রামবাবু। পুলিশরা খুব গরিব। সবদিক থেকেই। হাতে যখন বন্দুক তুলে ধরি তখন আমরা পশু। হাতে বন্দুক না থাকলে আমরা কোন কাজের নই।' এই কথাটা রামবাবুকে বলার জন্য তার মুখে এসেছিল কিন্তু বলা হল না। বলতে সে পারল না। মনে মনে তার ভীষণ ইচ্ছে করল রামবাবুকে সাহস যোগানোর। নানা ভাবে তাকে অন্যমনস্ক করে রাখার। কিন্তু পারল না। পথঘাট পেরিয়ে, ধানের ক্ষেত পেছনে ফেলে, গভীর বনে ঢুকে জীপটা হঠাৎ থেমে গেল। পুলিশগুলো জীপ থেকে নামল। নিয়ম মাফিক হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁড়াল।

'এগিয়ে চল। কেউটের বাচ্চার ওপর নজর রাখ।' ডি. এস. পি. রেড্ডি, এস. আই. শিবলিঙ্গম্ গাড়ি থেকে নেমে হুকুম দিল। খাসিং-এর হাতেও বন্দুক।

নিয়ম মাফিক ওরা রামবাবুকে মাঝখানে রেখে হাঁটছিল। সামনে এস. আই. পিছনে ডি. এস. পি.। রামবাবুর হাতের হাতকড়াগুলো ঐ বনে যেন বিচ্ছিরি আওয়াজ করছিল। তার হাত ভার হয়ে এসেছিল। ওদের বুটের শব্দে মনে হচ্ছিল বনের গাছগুলো কাশছে। একটি পাতা নড়লেও ওরা থমকে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

আর রামবাবুর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ওদের মধ্যে থেকে, ওদের সঙ্গে চলতে চলতে একনাগাড়ে বকবক করে যাচ্ছিল। একের পর এক বিষয়ে সে তার কথা বলে যাচ্ছিল। সবার ওপরে মানুষ। স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে। দেশের পরিস্থিতি, রাজনৈতিক দলের কর্তব্য, পথ এবং মতের মিল ও গরমিল, বিশ্বের দিকে দিকে বিপ্লবীদের কার্যাবলী, শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শাসকের হাতে কোর্ট-কাছারি, ভারতের শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ আরও কত বিষয়ের সে নানা কথা বলে যাচ্ছিল। এমন ভাবে বলছিল যে, যারা শুনছিল তাদের কখনও হাসি পাচ্ছিল আবার কখনও মন ভার হয়ে উঠছিল। সমানে সে বলে যাচ্ছে আর পুলিশের

সরু পায়ে পা মিলিয়ে সমানে হেঁটে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে তার পিঠে বন্দুকের নলি ঠেকছিল। কিন্তু সেদিকে যেন তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তার যেন সব জানা হয়ে গেছে।

'আমি নাকি দেশদ্রোহী। আমার বয়স চোদ্দ। চোদ্দ বছরের দেশদ্রোহী। আমার নিশ্বাসে, প্রশ্বাসে দেশদ্রোহীর বাতাস। আমি দেশদ্রোহী অতএব আমি যে ভূমিতে জন্মেছি সেটা আমার জন্মভূমি নয়। সেখানে আমার কোন অধিকার নেই। আমার গান, আমার গল্প লক্ষ লক্ষ মানুষ শুনেছে। যারা শুনেছেন তারা শোনাবেন। সত্য বলে যা বুঝেছি, তাই গান ও গল্পের মাধ্যমে শুনিয়েছি। আমাকে লুকিয়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু আমার গান আর গল্প সে তো আর হারিয়ে যাবে না। আমাকে সরিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু আমার গান আর গল্প সেগুলো তো মুখে মুখে ফেরে। আপনারা শাসকদের এক একটা নাটবল্টু। আর আমরা গরিবদের পক্ষে। আমরা জিতব কি হারব ইতিহাস তার বিচার করবে। একটা প্রশ্ন করি, আপনারা যা করেন, সব সময় কি ইচ্ছে করে করেন? বিবেকের স্বীকৃতি থাকে? শত্রুপক্ষের কাজ আপনারা আর কতদিন করবেন? যে শাসন ব্যবস্থা আপনারা রক্ষা করতে জীবন দিচ্ছেন সেটা আপনাদের কম ক্ষতি করছে? আপনাদের কি অবস্থা? আপনাদের পরিবারের কি অবস্থা? ছেলেমেয়েদের কথা কি ভেবেছেন? ভাবুন। চিন্তা করুন।' রামবাবু বলতে বলতে মাঝে মাঝে থামছিল। এমন ভাবে বলছিল যে তার কথাগুলো পুলিশদের মনে গেঁথে যাচ্ছিল। ওরা চুপচাপ শুনছিল। বুটের শব্দে ওরা নিজেরাই যেন বিরক্ত হচ্ছিল।

গন্তব্যস্থল এসে গেল। এসেই থেমে গেল। নিয়মমাফিক পুলিশ-গুলো সারি বেঁধে দাঁড়াল। এস. আই. শিবলিঙ্গম্ যেন কত আদরে বলল, 'ওহে রামবাবু, তুমি এখনও বাচ্চা ছেলে। বুঝে না বুঝে অনেক কথা বকবক করেছ। কি বা দেখলে আর কি বা জান।'

'আমাদের এসব কথা জানার জন্য বয়সের কোন বাধা নেই স্যার। ছেলেমেয়ে, ছোটবড়ো, বুড়োবুড়ি সবাই জানতে পারে। আমরা যে বই

পাড়ি সেগুলো বিজ্ঞান ভিত্তিক। যদি কিছু শিখতে চান, জানতে চান তাহলে তা আমাদের কাছেই শিখতে হবে। আপনাদের কাছে আমাদের কিছুই শেখার নেই, স্যার।'

'শোন রামবাবু, তুমি যদি বাড়ি ফিরে যেতে চাও, যদি স্কুলে ভাল-ভাবে পড়াশুনা করতে চাও, যদি সরকারী বৃত্তি পেতে চাও তো বল। তোমাকে ফুলের ওপর বসিয়ে তোমার বাড়িতে দিয়ে আসব। মা বাবার মনে আর দুঃখ দিও না, রামবাবু। তোমার দিকে তাকালে মায়া জাগে।'

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই রামবাবু হো হো করে হেসে বলল, 'স্যার আমার প্রতি আপনার দরদ উথলে পড়ছে। আমার সব কথা বলা হয়ে গেছে স্যার। এখন আপনারা আমাকে ফুলে বসাবেন না কোথায় বসাবেন তা আপনারাই জানেন।'

'তাই নাকি?' ডি. এস. পি. বলল।

'হ্যাঁ স্যার। আমি যা বলেছি তা বর্ণে বর্ণে সত্য।'

'সত্য কথা বলার যদি অভ্যেস থাকে তো বল, তোমার নেতারা কোথায়? তোমাদের আস্তানা কোথায়?'

রামবাবু হেসে বলল, 'আস্তানা জেনে কি করবেন স্যার? আপনাদের বুকে কি এত সাহস আছে যে যেতে পারবেন? এক সময় ছিল কিন্তু এখন নেই। প্রত্যেকটি গ্রামে, প্রত্যেক মায়ের বুকে, প্রতিটি ক্ষুধার্ত পেটে, সমস্যায় জর্জরিত প্রতিটি মানুষের মনে আমাদের আস্তানা রয়েছে। ক্ষমতা থাকে তো যান সেই আস্তানায়। আমি আর কি বলব।'

'অত্যন্ত বাজে কথা বলছ। সবকিছুর একটা সীমা থাকা চাই।'

'আমাদের কোন সীমা নেই স্যার। আমাদের সাহসের, আমাদের ভালবাসার, আমাদের স্নেহের কোন সীমা নেই। আর সীমা নেই বলেই আমাদের প্রাণে ভয়ও নেই। যার নীতি আছে সে প্রাণের ভয় করে না। নীতিকে আগলায়। প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে। অনেকটা আমার মতোই কথা বলে। পৃথিবীর যে কোন দেশের সত্যবাদীকে জিজ্ঞেস করুন সেও আমারই কথা স্বীকার করবে। সত্যিকারের ক্ষমতা তো আপনাদের হাতে

নেই। এই বন্দুক যারা তৈরি করে ক্ষমতা তাদের হাতে। আচ্ছা বলুন তো, আপনাদের এই শরীরটা কি শুধু ধনীদের রক্ষা করার জন্য? ওদের বাঁচানোর জন্য আপনারা কি সারাটা জীবন ওদের দেওয়া এই জামা-কাপড় পরে যাবেন? শাসকরা আমাদের সম্পর্কে আপনাদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই আপনারা, ওরা যা বলে, তাই করেন। ওরা যা শোনায় তাই শোনেন। আপনারা যে বাড়িতে থাকেন সেটা কি সরকারের? আপনাদের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে যে বাতাস সেটা কি শোষকের? আপনারা যে জল খান সেটা কি ধনীর? যারা হাজার হাজার একর জমির মালিক তারা যে কত ক্ষতি করে দেশের তা আপনাদের নজরে পড়ে না? আপনারা আমার দাদার বয়সী। আপনারা ভাবুন, চিন্তা করুন। এইসব বন্দুকগুলো গরিব মানুষের পক্ষে ব্যবহার করুন।'

'এই শুয়োরের বাচ্চা, চুপ কর।' ডি. এস. পি. বলল।

'টু টুয়েন্টি থ্রি, ফায়ার হিম।'

রামবাবু আবার হেসে বলল, 'স্যার আমাকে মেরে ফেলবেন? কিন্তু আমাদের সবাইকে তো মারতে পারবেন না স্যার। আমাদের চিন্তা ভাবনা তো গুলিতে শেষ হয়ে যাবে না। ঠিক আছে, নিন আপনাদের কাজ সেরে নিন।' বলে রামবাবু চোখ বুজে দাঁড়াল।

রামমূর্তি 'নো স্যার' বলে বন্দুক নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'ওয়ান নাইন্টি নাইন।'

'নো স্যার।'

'টু হান্‌ড্রেড।'

'নো স্যার।'

এক এক করে প্রত্যেক পুলিশ বন্দুক নামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এস. আই. ডি. এস. পি. মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল।

পরমুহূর্তেই ডি. এস. পির পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে গেল।

রামবাবুর শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এত রক্ত গড়াতে লাগল যে, সেখানকার মাটি হুপ্‌ হুপ্‌ করতে লাগল।

সেই লাল মাটি যেন আকাশে প্রতিফলিত হতে লাগল।

কাজ শেষ করে জীপ ফিরে যাচ্ছিল।

পথে হঠাৎ জীপের জল ফুরিয়ে গেল। জীপ থেমে গেল। সবাই পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন করতে লাগল, 'এখানে জল কোথায় পাব?'

কিছুক্ষণ ভেবে রামমূর্তি বলল, 'যাওয়ার সময় স্যার ওদিকে জল দেখছি মনে হচ্ছে।' ভয়ে ভয়ে ডি. এস. পি-কে সে বলল।

'তাহলে ওয়ান নাইন্টি তুমি রামমূর্তির সঙ্গে যাও। বলল এস. আই. শিবলিঙ্গম্।

'আমি যাব না স্যার, খুব ভয় করছে।'

এক রামমূর্তি বাদে সবাই ভয়ে যেতে চাইল না। 'আজকে থানায় গেলে তোমাদের অবস্থা দেখতে পাবে।' গোঁফে তা দিয়ে ডি. এস. পি. রেড্ডি বলল। তারপর রামমূর্তিকে নিয়ে জলের সন্ধানে এগিয়ে গেল।

ঐ গভীর বনে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গেল ওরা। রামমূর্তির মনে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। সমস্ত বনের গাছের পাতায় পাতায় রামবাবুর কথা যেন-ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। শুধু কি কথা, তার প্রাণখোলা হাসিও মাঝে মাঝে রামমূর্তির কানে বাজছিল। রামবাবু যেন গাছে গাছে বসে আছে, হাসছে।

'রামমূর্তি তোমার কি ভয় করছে?' ডি. এস. পি. বলল।

'না স্যার।'

আবার ওরা হাঁটতে লাগল।

রামমূর্তির মন যেন বাঁধভাঙা নদী হয়ে গেছে। প্রতি মুহূর্ত সে দেখতে পাচ্ছিল রামবাবু তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসছে। সে দেখতে পাচ্ছিল রক্তাক্ত মাটিতে শুয়ে রামবাবু হাসিমুখে তার দিকে হাত বাড়াচ্ছে।

আস্তে আস্তে রামমূর্তির মন শক্ত হচ্ছিল। মুহূর্তে বন্দুকের গুলিতে ডি. এস. পি. রেড্ডিকে সে মাটিতে ফেলে দিল। তার পিস্তল খাপ থেকে টেনে বের করে রামমূর্তি যেখানে রামবাবুর মৃতদেহ পড়েছিল

সেদিকে ছুটে গেল।

ছদিন পরে খবরের কাগজে বেরল : পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ছুজন নকশাল মৃত। তাদের মধ্যে একজনের বয়স চোদ্দ বলে জানা গেছে। একটি বন্দুক, ছুটি তাজা বোমা ও মাওপন্থী পুস্তিকাও পাওয়া গেছে। কোন পুলিশ হত অথবা আহত হয়নি।

তুষাগুন

বি টি. রামানুজম্

নূকারাজু আকাশের দিকে তাকাল। ছাইয়ের ছোপ লাগা চাঁদের দিকে তাকিয়ে তার তত ভাল লাগল না। ভাল না লাগার আরও একটা কারণ ছিল। কাছাকাছি অনেকগুলো কালো মেঘের আনাগোনা। ওরা চাঁদকে ঢাকতে যাচ্ছে। চাঁদ যেন ওদের সরে যেতে বলছে। দূর থেকে দেখে অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। চাঁদ কি ভাবে ওদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানর চেষ্টা করছে। নূকারাজু আপন মনে বলে উঠল, 'চাঁদেরও জ্বালা কম নয়।'

নূকারাজু আবার আকাশের দিকে তাকাল। ছদিকে কালো পাহাড়। ওরা যেন চারদিক ঘিরে রয়েছে। ওই পাহাড়ের মাঝে পথ। বিরাট অজগর সাপের মত পিচ্‌ঢালা পথ মাটিতে শুয়ে রয়েছে। রাস্তার মাঝে রিক্সার উপরে বসে আছে। বেশ শীত পড়েছে।

'বিড়িও নেই যে খাব।'

নূকারাজু রাস্তার পাশের ঝোপ ঝাড়ের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কান খাড়া করে শব্দ শোনার অপেক্ষায় তার সময় কাটছে।

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তার। এই কঠিন নিস্তব্ধতা তার খিদের জ্বালা যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। নূকারাজু জানে খিদের জ্বালা কি করে সহ্য করতে হয়।

অপেক্ষা আর অপেক্ষা। কোন্ দিকেই বা তাকানো যায়। আকাশে কালো কালো মেঘ। চাঁদে ছোপ ছোপ ছাই। কালো রাস্তাও বেশি দূর দেখা যায় না। রাস্তাটা যেন কিছু দূরের মধ্যে ঢালুর দিকে গড়িয়ে গেছে। ওখান থেকে ছ-মাইলের মধ্যেই যে থানা রয়েছে তা নূকারাজু জানে।

সে পকেটে হাত ঢোকালো। কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া পকেটে আর কিছুই নেই। সেই খুচরোও খুব বেশি নয়। নূকারাজুর মুঠো শক্ত হয়ে এল। 'তিনদিনে মাত্র তিন টাকা! কি যে পোড়া দিনকাল পড়েছে।'

নূকারাজু আবার পথের পাশের দিকে তাকাল। ঝোপঝাড় আর গাছগুলো যেন চোরের মত দেখাচ্ছে। কতক্ষণ হয়েছে ওরা ঐ ঝোপের মধ্যে ঢুকেছে। এখনও ফিরছে না। ওদের জন্যেই তো অপেক্ষা।

গাঁয়ের শেষে একটা চালাঘরে থাকে নূকারাজু। তার বউ মারা গেছে অনেক দিন আগে। আপনজন যে তার নেই তা নয় কিন্তু ওদের থাকা না থাকা নূকারাজুর কাছে একই ব্যাপার।

আঠারো বছরের মেয়ে পাইডাম্মার কপাল পুড়েছে। পাইডাম্মার বয়স যখন পনেরো তখন যারাই তার দিকে তাকাতো তাদের চোখ জুড়িয়ে যেত। সবসময় হরিণের মত চঞ্চল ছিল সে। নীলাইয়ার সাথে তার বিয়ে দিল নূকারাজু। নীলাইয়া ছিল রেলের খালাসী। সব সময় কাজ পাগল লোক। নিষ্ঠাবান কর্মী। দুর্ঘটনায় পড়ে সে মারা গেল। বিয়ের বছরেই পাইডাম্মা গর্ভবতী হল। স্বামী মারা যাবার পর দিন কয়েক কেঁদে পাইডাম্মা আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। এর-ওর বাড়ির ঝি-গিরি শুরু করল। হাঁড়িবাসন মাজা, ঘর মোছা, জলতোলা, ক্যারিয়ারে করে অফিসে ভাত দিয়ে আসা—এসব ছিল ওর দৈনন্দিন কাজ। ওর রূপের

জন্যই হোক অথবা পুরুষদের টলিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকার জন্যই হোক এক বড় ঘরের ছেলের কল্যাণে তাকে গর্ভবতী হতে হল।

নূকারাজু আর পাইডাম্মার লজ্জায় মাথা কাটা গেল। পাইডাম্মার বাচ্চা হল বটে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে মারা গেল। তারপর থেকেই পাইডাম্মার চাউনিতে ভাবা ছিল না। সে চাউনি দেখে বোঝার উপায় নেই যে সে খুশী না অখুশী। শুধু চাউনি নয় তার কথাবার্তাও বোঝা যায় না।

নূকারাজের দ্বিতীয় মেয়ের নাম মা-লছমী। বাচ্চা বয়স থেকেই মা-লছমী একটু ছলবলে ছিল। বয়স বাড়াতেই সে কার হাত ধরে পালিয়ে গেল।

নূকারাজুর ছেলেও একটি আছে। কিন্তু সে ছেলেও একেবারে বখে গেছে। ছেলেটা বিড়ি আর চুট্টা খেতে পারে আর গুলি এবং খুচরো পয়সার জুয়োতে মেতে থাকে। অন্য কোন কাজে তার মন বসে না। চারদিন ধরে ঘরে ভাত তো দূরের কথা, ফ্যানও নেই। কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেও পাইডাম্মাকে ভালভাবে দেখতে চায় না। ওষুধের দোকানে গিয়ে জ্বর বলে একটা ওষুধ নিয়ে আসতে হবে।

ওষুধের জন্য যে কত নেবে তা সে জানে না। হয়ত কম হবে না।

'কি রে বাবা, একটা বোধ হয় বাজে।' সে নিজেকে নিজে বলল। সেদিন রাত ন'টার সময় নূকারাজু একটা সওয়ারী পেল। ঠায় অনেক ঘণ্টা বসেছিল। বসে বসে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঝিমোচ্ছিল। এমন সময় কারা যেন এসে 'এই যে' বলে ডাকল তাকে।

চোখ খুলে নূকারাজু দুজনকে দেখতে পেল। একটা ব্যাটা ছেলে, একটা মেয়েছেলে। লোকটার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মেয়েটার বোধ হয় কুড়িও নয়।

'যাবে?' লোকটা জিজ্ঞাসা করল।

নূকারাজু সিটটাকে গুছিয়ে ঠিক করে রাখল।

'কত নেবে?'

'কোথায় যেতে হবে ?'

'অংশন যাব। মাঝপথে একটু নামতে হবে। কাজ আছে। এই আধঘন্টা লাগবে।'

লোকটা মেয়েটার দিকে তাকাল। মনে হল মেয়েটা হাসল। তবে সে হাসি নূকারাজু দেখতে পেল না অন্ধকারে।

লোকটার দিকে নূকারাজু তাকাল। তার পরণে জামা আর পাজামা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। নূকারাজু যেন বুঝতে পারল ওদের মতলব। তারপর সে মেয়েটার দিকে তাকাল। মেয়েটার রং কালো।

'তিন টাকা দেবেন, বাবু!'

'মাঝখানে ঐ ঝোপের কাছে একটু থামতে হবে, বুঝতে পেরেছ ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। বুঝেছি।'

ওদের পথের ধারে ঝোপের কাছে নামিয়ে অপেক্ষা করছে তো করছেই। এতক্ষণ ওদের জন্যই অপেক্ষা করছে সে।

আকাশের কালো মেঘটা চাঁদের উপর দিয়ে চলে গেল। বিরাট এক রাজ্য জয় করার মত চাঁদ বেরিয়ে পড়ল।

নূকারাজু ঝোপের দিকে তাকাল। জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোতে ছুটো গাছ ভূতের মত দেখাচ্ছিল। ওদের মাঝে ঝোপগুলোকেও মনে হচ্ছিল যেন ভূতের বাচ্চা। (অবশ্য নূকারাজু কোনদিন ভূত আছে কি না—থাকলেও ভূতের বাচ্চা হয় কি না তা ভাবেনি।)

চুড়ির শব্দ শুনতে পেল নূকারাজু। হাঁকপাঁক করে তাকাতে লাগল। মেয়েটাকে সে দেখতে পেল। তার পেছনে সাদা পোষাক পরা লোকটাও আসছে দেখল।

ওরা এল। ওই আলো আঁধারি পরিবেশে মেয়েটিকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। সাদা পোষাক পরা লোকটা মেয়েটার এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে রইল। নূকারাজু রিক্সা থেকে নেমে দাঁড়াল। মেয়েটা ক্লান্তভাবে রিক্সায় বসল। লোকটা রিক্সায় উঠতে যাবে এমন সময় বুটের শব্দ শোনা গেল।

ওদের উপর জোরালো আলো পড়ল।

'কে ?' তিনটি কণ্ঠস্বর একসঙ্গে বলে উঠল।

কোন সাড়া শব্দ নেই। নুকারাজুর বুক টিবটিব করতে লাগল। কেউ কথা বলল না। লোকটা চুপচাপ কি যেন ভাবছে। তিন জোড়া বুটের শব্দ আরও কাছে আসছে। টর্চের আলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওদের উপরেই পড়ছে। ইউনিফর্ম পরা তিন জন এগিয়ে আসছে। মাথায় লাল টুপি পরা ঐ তিনটি লোক যেন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ওদের মাঝের লোকটার হাতে টর্চ।

রিক্সা থেকে হঠাৎ নেমে লোকটা যে দিকে ছুটে পালালো নুকারাজু ঝট করে সেদিকে তাকাল।

তিনজোড়া বুট লোকটা যেদিকে ছুটে গেল সেদিকে ছুটতে লাগল। ঝোপঝাড় দিয়ে লোকটা কোথায় যেন পালিয়ে গেছে। ওরা কয়েক মুহূর্ত ঝোপ ঝাড়ে আলো ফেলল। জোরে বিউগল বাজাতে লাগল। বিউগল-এর আওয়াজ শুনে নুকারাজু খুব ভয় পেল। কি যে করবে কিছু ভেবে পাচ্ছিল না। এমন সময় ওরা নুকারাজুর কাছে ছুটে এল।

'কে রে ওটা ?' কর্কশ গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে ওদের একজন জিজ্ঞেস করল।

নুকারাজু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। টর্চ ধরা লোকটা মেয়েটার উপর টর্চ মারল।

মেয়েটাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। জামা আর শাড়িতে ঝোপঝাড়ের খোঁচা লাগার চিহ্ন। চুলে ছোট ছোট পাতা জড়িয়ে রয়েছে। হাতে মাটি লেগে আছে।

'কে রে এটা ?' আরেকজন গর্জে উঠল।

'জানি না'। নুকারাজু দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

'জানি না মানে ?' তৃতীয় জন জিজ্ঞেস করল।

'জানি না। সত্যি বলছি।'

'আর যে পালিয়ে গেছে ঐ শুয়োরের বাচ্চাটা কে ?'

'জানি না। ও-ও সওয়ারী ছিল।'

'সওয়ারী ছিল ? খাকোৎ, সত্যি কথা বল, নইলে জেলে পুরে দেব।'

'সত্যি বলছি। সে–ও সওয়ারী ছিল। তিন টাকায় দর ঠিক হয়েছে।'

'তিন টাকায় তোর মাকে নিয়ে যাওয়ার দর ঠিক হয়েছে রে শালা ? বল ঠিক করে।' একজন বলল। এই জঘন্য কথা শুনে নূকারাজু থ বনে গেল। টর্চের তীব্র আলো তার মুখের উপর পড়ল। তার মুখ ঘামতে লাগল। ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল তার মুখে। রাগে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

'সত্যি কথা বলতে বলা হয়েছে, অমন গরুর মত তাকিয়ে আছিস কেন রে শালা, শুয়োরের বাচ্চা ?'

'সত্যি বলছি। ও আমার তিন টাকার সওয়ারী।'

'তিন টাকার ?' টর্চ হাতে লোকটা মেয়েটার মুখে একভাবে আলো ফেলে টর্চ ধরে রইল।

'কোথাকার মেয়ে তুই ? এদিকে এসেছিস কেন ?'

নূকারাজু টর্চ ধরা লোকটা এবং অন্য দুজন লোকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। টর্চ ধরা লোকটা যুবক। বয়স বছর পঁচিশেক হবে। আরেকজন বুনো শুয়োরের মত। তৃতীয় জনের বয়স পঁয়ত্রিশের মত।

বুনো শুয়োরের মত যার শরীর সে রিক্সার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। টর্চ ধরা লোকটা তার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রিক্সায় বসা মেয়েটার উপর আলো ফেলতে লাগল।

তৃতীয় জন ওদের দুজনের পেছনে দাঁড়িয়েছিল।

'এই !' বুনো শুয়োরদেহী গর্জে উঠল।

নূকারাজুর মনে হল যেন ক্ষুধার্ত বুনো শুয়োর খেঁকিয়ে উঠল।

মেয়েটা তার দিকে ক্লান্ত চোখে তাকাল।

তিন দিন ধরে খাস্‌নি নাকি ? অমন ভাবে তাকাচ্ছিস কেন ?'

মেয়েটা মাথা নাড়ল ক্লান্তভাবে।

'কি করিস্‌ ? রোজগার করিস্‌ ?' বিদ্রূপের স্বরে সে জিজ্ঞেস করল।

মেয়েটা ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

টর্চ ধরা লোকটা মেয়েটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কোন কথা বলল না। বুনো শুয়োরদেহী টর্চ ধরা হাত নিচের দিকে নামাতে নামাতে বলল, 'নিচে মারো। আর একটু নিচে।'

টর্চের আলো মেয়েটার মুখ থেকে নামতে নামতে বুকের ছেঁড়া জামার উপর থেমে গেল। ছেঁড়া জামা দেখে ওদের মনে হল মেয়েটার যৌবন যেন জামা ছিঁড়ে বেরোচ্ছে। ওর মুখ যত ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ওর বুক দেখে তা মনে হল না। মুহূর্তে শুয়োরদেহীর চোখ যেন ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ হয়ে গেল। সে হাতটা বাড়িয়ে বলল, 'আলো নিভিয়ে দাও।' টর্চের আলো নিভে গেল। মেয়েটা ক্ষীণ কণ্ঠে গোঙাতে লাগল।

'আলো জ্বালো'! শুয়োরদেহী বলল।

'কি-রে? চল, থানায় যাবি চল?'

এমনিতেই নুকরাজুর পেটটা ব্যথা করছিল। থানার কথা শুনে ওর গলা কেঁপে উঠল, 'আজ্ঞে বাবু, আমি রিক্সা চালাই। যে কোন সওয়ারী পেলে তুলি।'

'সওয়ারী পেলে, না? আরে এ-ই, অ্যাঁ— রিক্সায় একেবারে মহারানীর মত বসে আছে।' বুনো শুয়োরদেহীটা মেয়েটার হাত ধরে টান মারল।

'আমাকে ছেড়ে দিন।' মেয়েটি ক্ষীণ গলায় বলে উঠল। আবার টান মারলে মেয়েটা কাকুতি-মিনতি করে বলল, 'আমার শরীর খুব খারাপ। আমি খুব দুর্বল। আমাকে ছেড়ে দিন।'

'তাই নাকি? ঠিক আছে—তোর যা কিছু বলার সেখানে বলবি। নাব দেখি তাড়াতাড়ি।'

'শুনুন বাবু—আমার শরীর ভাল নয়। আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে ক্ষমা করুন।'

'এ—ই আমি যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে টর্চ মার।' বলে মেয়েটার হাত ধরে বুনো শুয়োরদেহী লোকটা মেয়েটাকে টানতে টানতে ঝোপের মধ্যে নিয়ে গেল। নুকারাজুর মাথা ঘুরছিল। পেট গুলোতে লাগল। ভগবানকে ডাকার মত সে আকাশের দিকে তাকাল। চন্দ্রকে ঢাকার

অন্য একটা বিরাট কালো মেঘ এগিয়ে যাচ্ছিল। তার কিছু দূরে আর একটা কালো মেঘ তার পেছনে পেছনে যাচ্ছিল।

একজন একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। আরেকজন রিক্সার উপর পা ছড়িয়ে শোয়ার ঢঙে বসে রইল।

নুকারাজু রিক্সার সামনের চাকার কাছে বসে পড়ল। সামনের চাকা-টাকে সে ঝোপের দিকে ঘুরিয়ে রেখেছিল। হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে মাঝে মাঝে ঐ ঝোপের দিকে সে তাকাতে লাগল। সারাদিন তার এক বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাটছিল। আপন মনে বিড় বিড় করে কি যেন সে বলতে লাগল।

'আরে এই শালা কি বিড়বিড় করছিস?' পেছন দিক দিয়ে একটা বুটের আঘাত তার পিঠে লাগল। মাটিতে পড়ে গেল সে। মুহূর্তে তার মাথা গরম হয়ে গেল। রাগে কাঁপতে লাগল তার শরীর।

'বেশি ঢঙ করলে তুই ঠ্যাং ধরে চিরে ফেলব শালা।'

নুকারাজুর কান্না পেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে 'ভগবান' বলে উঠল। সে ভাবতে লাগল তিন দিন ধরে না-খাওয়া মেয়েটার অবস্থা এই তিন জনের খপ্পরে পড়ে কি হবে! সে-কথা ভেবে তার আশঙ্কাও জাগল।

অন্যদিকে ইউনিফর্ম পরা বুনো শুয়োরদেহী ইউনিফর্ম খুলে ফেলে মেয়েটিকে বিবস্ত্র করে তার সমস্ত শরীরের উপর আক্রমণ চালাতে লাগল।

মেয়েটা আর্তনাদ করতে লাগল।

এদিকে রিক্সায় বসা পুলিশটা বলল, 'আবাধ্য ঢঙ করে চেঁচাচ্ছে।'

'ওটা চেঁচানি নয়— সুখ পাচ্ছে তো—তাই।'

নুকারাজু আকাশের দিকে তাকিয়ে ভগবানের কাছে যেন প্রার্থনা করছে, 'ঠাকুর, এক্ষুণি একটা বজ্র ফেলে দাও ওদের উপর।'

ওদিক থেকে শুয়োরের ডাক শোনা গেল, 'টর্চ মারো।' টর্চের আলো পড়ল। কাপড় জামা গুটিয়ে সে ঝোপ থেকে উঠে আসছে। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'বী কেয়ারফুল, মারা না যায়!' বেল্ট ঠিক করতে করতে সে সরে গেল। টর্চ ধরা লোকটা টর্চটা অন্যজনের হাতে

দিয়ে নূকারাজুকে দেখিয়ে বলল, 'ওর দিকে নজর রেখো।'

'ওর শরীরে জ্ঞানবুদ্ধি বলে কিছু আছে নাকি?'

'কিছুটা আছে মনে হচ্ছে।'

'ওটুকু সব শালার মধ্যেই থাকে।'

দ্বিতীয় জন ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। এখন টর্চ ধরা লোকটা টর্চ নিভিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরাল।

'রাস্কেলটা তাড়াতাড়ি আসতে পারে না!'

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্কেলটা ফিরে এল।

'শেষ খেপ তোমার। তারপরই ওকে—

তৃতীয় জন ঝোপের ভেতরে ঢুকে গেল।

নূকারাজুর যেমন কান্না পাচ্ছিল তেমনি তার বুক জ্বলছিল রাগে।

মনে মনে সে বলছিল, 'এই নিয়ে চারজন হল।' নূকারাজুর কাছে অজানা ছিল যে যাদের মাইনে কম তারা মাঝে মাঝে অধিকারের লোভে এগোতে চায়, তেমন কিছু করতে না পেরে, সমাজের বিভিন্ন দিকে যায়, ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। ওরা পারে না বাড়ির বউকে সুখী করতে। বউয়ের কাছেও সুখ না পেয়ে এইভাবে সুযোগ পেয়ে ঝোপে ঝাড়ে সুখ পেতে চায়। এইসব ছোট ছোট মাইনে পাওয়া লোকগুলো আবার বড় মাইনে পাওয়া লোকের অধীন। ওদেরও বাবা আছে। সমাজের বাবার বাবারাই ভগবানকে সৃষ্টি করেছেন। ভগবান ওদেরকে সৃষ্টি করেননি।

তৃতীয়জনও ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। বাকি দুজনের মত সেও অন্যদিকে চলে গেল। কালো মেঘগুলো চাঁদের উপর দিয়ে এগিয়ে গেল। ঐ নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রে নূকারাজু শুনতে পেল বুটের আওয়াজ ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। তার কান্না পেল। কি করা যায়। মেয়েটাই বা ঝোপে কি করছে? মরেছে না বেঁচে আছে? সত্যি যদি মরে গিয়ে থাকে? আর ভাবতে না পেরে নূকারাজু চোখ বুজল। কিসের যেন শব্দ শুনে সে চোখ খুলে তাকাল। সেই সাদা পোশাক পরা লোকটা, যে পালিয়েছিল, সে এসেছে।

'কি হয়েছিল ? কোথায় ছিলে ? কি খুঁজছ ?' বলল নুকারাজু।

'হাত ঘড়িটা খুলে পড়ে গেছে। সোনার ব্যাণ্ডটাও। বলা যায় না ঐ শালী হয়ত লুকিয়ে রেখেছে!'

ওকে আর গাল দিচ্ছ কেন বাবু ? ও হয়ত মারাই গেছে।'

'ও মরবে ? আরও কতজনকে রোগ ধরিয়ে মরবে।'

'সত্যি বলছি বাবু—ওকে হাসপাতালে নিয়ে যান।'

'মাথা খারাপ ? ঐ হারামজাদীটাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সব প্রকাশ হয়ে যাবে না ?'

'কি প্রকাশ হবে বাবু ? হারামজাদীর কাছে গেলে কিছু হয় না ? ভোগ করার বেলায় তো চার চারজনে মিলে ভোগ করলেন আর হাসপাতালে নিয়ে গেলেই সব বেরিয়ে পড়বে ?' নুকারাজুর কথায় যন্ত্রণা ছিল। সে লোকটার হাত ধরে বলল, 'একটু ভেবে দেখুন, বাবু !'

লোকটা ছাড় বলে নুকারাজুকে এক ধাক্কা মারল। ন্যাজে পা পড়া সাপের মত নুকারাজুর মন ফুঁসে উঠল। ততক্ষণে লোকটা ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল। এতক্ষণ ধরে ধিকিধিকি করে তার মনে যে তুষাগুন জ্বলছিল তা যেন দাবানল সৃষ্টি করতে চায়। হাতগুলো তার নিশ্‌পিশ্‌ করতে লাগল। আক্রোশ যে মেটাবে তার কোন উপায় নেই। একটানে রিক্সার চেনটাকে সে ছিঁড়ে ফেলল। এর আগে যে পথ দিয়ে লোকটা গেল সেই পথে সে চেনটি হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল। সে জ্যোৎস্নার আলোতে দেখতে পেল ঐ লোকটা কি যেন খুঁজছে। ছোট ছোট গাছগুলো সে উপড়ে ফেলছে। ঘামে ওর জামা ভিজে গেছে। পাশেই ওই মেয়েটা পড়ে আছে। তার কোন জ্ঞান নেই। গায়ের কাপড়টা জড়ো করে ফেলা আছে। লোকটা বিড়বিড় করে বলল, 'মারা যায়নি তো ?' সে জড়ো করা কাপড়টাকে তুলে দূরে ফেলে দিল। মেয়েটার নগ্ন শরীর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। তখনও সে তার শরীরের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখছিল। যতই বীভৎস দেখাক লোকটা তারদিকে পশুর মত তাকাচ্ছিল। আর সেই সময়, অদূরে দাঁড়িয়ে, এসব দেখতে দেখতে আর

থাকতে না পেরে, নুকারাজুর মনের ঘৃণার আগুন ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার উপর। নুকারাজু রিক্সার ঐ চেন দিয়ে প্রচণ্ড জোরে লোকটার মাথায় মারল। মাথায় তো বটেই ঘামে ভেজা পিঠের ওপরও চেনটা পড়ল। মাথা ফেটে রক্ত ঝরল। তারপর, লোকটার উপর, একটার পর একটা চেনের আঘাত পড়তে লাগল। লোকটার গলায় চেনটা জড়িয়ে টানতে টানতে নুকারাজু তাকে রাস্তার উপরে নিয়ে এল। লোকটার শরীর মৃতদেহের মত ভারী হয়ে গেলেও, সেটা টানতে টানতে এনে, রাস্তায় ফেলে, নুকারাজু সেই শরীরের উপর সমানে মারতে লাগল চেন দিয়ে।

তারপর সে মেয়েটার কাছে গেল। মেয়েটাকে এনে সে রিক্সায় বসাল। তার শরীরের উপর এক চিলতে কাপড় নেই। সে বেঁচে আছে কি মারা গেছে নুকারাজু তা জানে না। 'মরলে মরবে, বাঁচলে বাঁচবে!' বলতে বলতে সে ঝোপ থেকে কাপড়টা নিয়ে এসে মেয়েটার শরীরে জড়িয়ে দিল। তারপর তারদিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, একে বাঁচাতেই হবে। বিড়বিড় করে সে বলল, 'ওমা—তুই বাঁচবি কিনা জানিনে—চার চারটে রাক্ষস তোকে ছিঁড়ে খেয়েছে। তবু তোকে একবার আমি হাসপাতালে নিয়ে যাব।'

নুকারাজু রিক্সাটাকে রাস্তার একধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে টেনে নিয়ে গেল।

তেতোবড়ি

.. রঘুশ্রী

ডাক্তার জগন্নাথম্ এম. বি. বি. এস.

রুগীদের যত্নসহকারে পরীক্ষা করে দেখা হয়।

উপরের এই কথাগুলো একটি বোর্ডে লেখা ছিল। যে কথা ঐ বোর্ডে লেখা ছিল না তা হল রুগী দেখার ফি পঁচিশ টাকা। ডাক্তার নিজের

চেম্বার থেকে বেরিয়ে গাড়িতে বসে মুহূর্তে নাগালের বাইরে চলে গেল। থামল আধ মাইল দূরে, একটি বিরাট বাড়ির সামনে।

'হ্যালো ডাক্তার। আসুন। আসুন। এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল। এত দেরি করলেন কেন?' হাতের তাসগুলো ফাটিতে ফাটতে বলল আইনবিদ মহেশ্বরম্।

'আপনি না আসলে মশাই, আসরটাই জমে না।' বোতলের বীয়ার গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বলল অজন্তা হোটেলের মালিক রঙ্গনাথম্।

'ভাল কথা এত দেরি হল কেন?' টেনে টেনে বলল এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গোবিন্দাচারি।

এত লোকের আগ্রহ দেখে ডাক্তার জগন্নাথম্ মনে মনে খুশী হল।

'কি করব বলুন, রোজ যা হয় তাই হয়েছে। বেরুতে তো চেয়েছি আপনাদের আগেই। কিন্তু চাইলেই তো আর হয় না। বেরুবো ঠিক এমন সময় এক হারামজাদা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে অস্থির কাণ্ড করে তুলল। ওর বউ নাকি মরমর। আমি তার বাড়িতে তক্ষুনি না গেলে সে নাকি বাঁচবে না। যা-ই বলি শুনতে চায়নি। শেষে হাতে পায়ে ধরে টানাটানি আরম্ভ করল। একেবারে নাছোড়বান্দা। অগত্যা আর কি করি, যেতেই হল। ওর বাড়িতে গিয়ে ওর বউকে দেখে, আবার চেম্বারে ফিরে গিয়ে সোজা এখানে চলে এলাম।' ডাক্তার বলল।

'এমনি দেখে এলেন, না...' হাসতে হাসতে বলল মহেশ্বরম্।

'আঃ, আবার ওসব খোঁচা মারা কেন। যা চলছে, চলুক গোবিন্দ।' তাসের ওপর নজর রেখেই রঙ্গনাথম্ বলল।

ওটা একটা নাইট ক্লাব। নানা ধরণের পয়সাওয়ালাদের এখানে আড্ডা বসে। সমাজের মাথা ওরা। কেউ স্কুলের সেক্রেটারী, কেউ রাজনৈতিক নেতা, আবার কেউ বা বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। সমাজে যাদের নাম-ডাক আছে, যারা প্রকাশ্যে খারাপ কাজ করে না তারা সব জড়ো হয় রাত্রে। মদ খায়, বান্ধবীদের সাথে মেলামেশা করে। তাস খেলে, নাচে। এটা নাকি প্রত্যেকের জীবনে অপরিহার্য।

এই ধরনের বহু নামকরা লোকের মধ্যে একজন হল ডাক্তার জগন্নাথম্। নিজের কাজের চেয়ে এই নাইট ক্লাবের প্রতি তার টান বেশি। রাত আটটা বেজে গেলে আর সে ঠিক থাকতে পারে না। ক্লাবে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। যত রুগী থাক সে ফিরিয়ে দেয়। কাউকে বলে, 'আরে বাবা আমিও তো মানুষ। আমারও তো ঘর সংসার আছে? কখনও কখনও পুরোনো রুগী যদি আসে তাদের আগের ওষুধটাই খেতে বলে, ঝট্ করে চেম্বার থেকে বেরিয়ে, গাড়িতে উঠে চলে যায়।

ডাক্তার জগন্নাথমের স্ত্রীর হিষ্ট্রিরিয়ার রোগ আছে। ছেলেমেয়েদের দেখার ভার আয়ার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। ওরা দুজনে স্কুলে পড়ে।

একদিন ডাক্তারগিন্নীর অসুখের বাড়াবাড়ি হয়েছিল। বাড়িতে আয়া ছাড়া আর কেউ ছিল না। সে তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে চেম্বারে ফোন করল। বিরক্তির সঙ্গে জগন্নাথম্ ফোন তুলল। আয়া বলে যাচ্ছিল, 'বাবু, মায়ের খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে। জ্ঞান নেই। শরীর কাঠ হয়ে পড়ে আছে। আপনি এক্ষুনি চলে আসুন। আমি একা আছি। কি করব ভেবে পাচ্ছি না।...'

সব কথা শুনেই ডাক্তার জগন্নাথম্ বলল, 'কি করতে হবে ভেবে যখন পাচ্ছ না, তখন আর ভাবতে ও হবে না। যা বলছি তাই কর। আলমারির কোণে ছোট খামে যে ট্যাবলেটগুলো আছে ওগুলো খাইয়ে দাও। এসব ছোটখাট ব্যাপারে ফোন করা উচিত হয়নি। ওর অসুখ তো সারবে না। আমার কপালে যা আছে তা-ই হবে। এখন আমার ক্লাবে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। ট্যাবলেট মুখে পুরে জল ঢেলে দেবে। ট্যাবলেটগুলো যেন পেটে যায়।'

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে দড়াম্ করে জগন্নাথম্ ফোন রেখে দিল।

আয়ার খুব খারাপ লাগল। বউয়ের অসুখের বাড়াবাড়ির কথা শুনেও এত হাঁকপাঁক করে ক্লাবে চলে যাওয়া তার কাছে ভাল লাগল না। তবু আয়া হয়ে সে আর কি বা করতে পারে? অগত্যা ডাক্তারের কথামত

আলমারি থেকে ট্যাবলেট বের করে ডাক্তারগিন্নী কুসুমকে খাইয়ে জল খাইয়ে দিল।

ওষুধ খাওয়ানোর কিছুক্ষণ পরে আয়ার মনে হল, কুসুম ঘুমিয়ে পড়েছে। আরও পরে আয়া বিছানায় শোওয়া বাচ্চাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। নিষ্পাপ শিশু। ওদের দেখলে আয়ার খুব মায়া হয়। বাপ নাইটক্লাবের দাসানুদাস, মা হিস্টিরিয়ার দাস। এই দুজনের মুক্তি কোথায়? আয়া ভাবল, সে না থাকলে এই পরিবারের অবস্থা কি হবে।

কিছুক্ষণ ভাবতেই তার ভয় করল। ঐ বাচ্চাদের জন্যই তাকে হয়ত অনেক বছর এই বাড়িতে থাকতে হবে।

'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু।' বলতে বলতে একটা বুড়ি এল। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে ডাক্তার তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? অত চেঁচাতে চেঁচাতে আসছ কেন?'

'ডাক্তারবাবু আমার ছেলেকে বাঁচান। আপনাকেই আমরা বিশ্বাস করি। আপনি দেখলেই আমার ছেলে বেঁচে উঠবে। আপনার হাতে ওর জীবন। ঐ ছেলেই আমার অন্ধের যষ্টি। চোখের মনি।...' বুড়ি বলতে লাগল।

'দেখ, এটা কান্নার জায়গা নয়। এখানে অত হাঁকপাঁক করলে চলে না। যা বলতে চাও, তাড়াতাড়ি বল।' ডাক্তার বলল।

ডাক্তারের স্বরে বিরক্তি ও কঠোরতা ফুটে ওঠে। এর কারণ আছে। ডাক্তারের মন পড়ে রয়েছে নাইটক্লাবে। বন্ধুরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। বুড়িটা তার ক্লাবে যাওয়ার মেজাজই নষ্ট করে দিল।

'সকালে ডাক্তারবাবু, আমার ছেলেটা ভালই ছিল। দুপুরে বমি করল। দু একবার বমি করাতে অত গা করিনি। ভেবেছিলাম আর বমি করবে না। সন্ধ্যে থেকে শুধু বমি নয়, জলের মত পায়খানাও হচ্ছে। ছেলেটা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। বার বার বলছে, "আমি আর বাঁচবো না।" ওর কথা শুনে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এখন আপনিই দয়া করে আমার ছেলেকে বাঁচান।' বুড়ি কাতরভাবে বলল।

এই ধরনের নাকিকান্না রুগীদের কাছে এর আগে বহুবার ডাক্তার জগন্নাথম্ শুনেছে। এসবে তার মনে দাগ কাটে না। কি যেন বুড়িকে বলতে যাবে এমন সময় তার চেম্বারের সামনে একটি গাড়ি থামল। গাড়ি থেকে একটি লোককে বেরিয়ে আসতে দেখেই জগন্নাথম্ বলে উঠল, 'হ্যালো কেশববাবু যে! কি হয়েছে? এত ঘামছেন কেন?'

'ডাক্তার আমার ওয়াইফ বাথরুমে পা হড়কে পড়ে গেছেন। অজ্ঞান হওয়ার মত অবস্থা। এক্ষুনি চলে আসুন।' কেশববাবু বললেন।

কেশব রাওয়ের স্ত্রী ধনী পরিবারের মেয়ে। সুন্দরী, আজ কয়েক বছর কেশব রাওয়ের বাড়িতে ডাক্তার জগন্নাথমের ডাক পড়ে। ডাক্তারের মনে হল, আর মুহূর্তকালও দেরি করা উচিত নয়।

'চলুন। বলেই ওষুধের ব্যাগটা হাতে নিয়ে জগন্নাথম্ চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে বুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার ছেলের জন্য অন্য একটা ডাক্তার ডেকে নিয়ে যাও। এখন আমার সময় নেই।'

বুড়িটা ঠায় দাঁড়িয়েছিল। সে কাঁদছে, কি পাথর হয়ে গেছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কম্পাউণ্ডার বুড়িকে বলল, 'ডাক্তারবাবু আজ আর ফিরবেন না, মা।' এক পা এক পা করে বুড়ি বাড়ি ফিরে গেল।

পথে একটা বাড়িতে মরাকান্না শুনে ডাক্তার ভাবল, বুড়ির ছেলে হয়ত অক্কা পেয়েছে। কেশব রাওয়ের বাড়ির কাছে তার গাড়ি থামল। গাড়িটাকে গ্যারেজে ঢোকাতে বারণ করে ড্রাইভারের দিকে না তাকিয়েই কেশব রাও হন্ হন্ করে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। পেছনে ডাক্তার।

কেশবের স্ত্রীর বিছানার কাছে একটা চাকর ও একটা অষ্টাদশী দাঁড়িয়ে ছিল। কেশব বলল, 'কেমন আছ সীতা? তুমি পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ডাক্তারবাবুর কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। ডাক্তার এসেছেন।'

ডাক্তার জগন্নাথম্ ভাল করে পরীক্ষা করে কেশবের স্ত্রীকে দেখল। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করল। তারপর নিজের প্যাডে প্রেসক্রিপসন লিখে দিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিল।

কেশব রাও ডাক্তার জগন্নাথম্‌কে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে ঐ নাইট-

ক্লাবের কাছে নাৰিয়ে দিল। ধন্যবাদ জানিয়ে জগন্নাথম্ ক্লাবের ভেতর ঢুকে গেল। তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, আইনবিদ্ মহেশ্বরম্, অজন্তা হোটেলের মালিক রঙ্গনাথম্, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গোবিন্দাচারি। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই তার আসতে দেরি হওয়ায় সে ক্ষমা চেয়ে নিল।

'ঠিক আছে। আমাদের অবশ্য এক রাউণ্ড খেলা হয়ে গেছে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার গোবিন্দাচারি কার মুখ দেখে উঠেছেন কে জানে! প্রথম রাউণ্ডেই আমাদের সবাইকে শুইয়ে দিয়েছেন। যাক খেলা শুরু হোক আবার।'

খেলা আবার শুরু হল। তার আগে জগন্নাথমের সঙ্গে কথা সেরে আইনবিদ্ প্রত্যেকটা গ্লাসে বীয়ার ঢেলে দিলেন। সেই মুহূর্তে ডাক্তার জগন্নাথমের মধ্যে ডাক্তারের কোন অস্তিত্ব, কোন রুগীর স্মৃতি এমন কি নিজে যে একজন বাবা অথবা কোন মহিলার স্বামী এসব কোন চিন্তাই ছিল না। খেলা জমে উঠেছে। ওদের ঘিরে আরো কয়েকজন ধনী পরিবারের সন্তান খেলা দেখছিল। ওরাও খুব মজা পাচ্ছিল।

ওস্তাদের মার শেষ রাতে। ডাক্তার জগন্নাথমের মার মধ্যরাতেই। রাত বারোটা নাগাদ জগন্নাথমের পকেটে প্রায় পাঁচশ টাকা ঢুকে গেল। পাঁচশ টাকা জেতার আনন্দে জগন্নাথম্ খোসমেজাজে দু শ টাকার মদ কিনে সেখানে যারা খেলছিল আর যারা খেলা দেখছিল সবাইকে খাইয়ে দিল। মুহূর্তে জুয়োতে জেতা পাঁচশর মধ্যে দু শ টাকা ক্লাবের ম্যানেজারের হাতে পৌঁছে গেল।

মদ খাইয়ে আর খেয়ে ডাক্তারের এমন অবস্থা হয়েছে যে তার পা একদম চলছিল না। তাকে ধরাধরি করে তার বন্ধুরা, গাড়িতে তুলে, বাড়িতে পৌঁছে দিল।

পরের দিন দুপুরে ডাক্তার তার বন্ধুর কাছে যাবে এমন সময় কোত্থেকে অজানা দুটো লোক ছুটতে ছুটতে এসে তাকে বলল, 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, তাড়াতাড়ি চলুন।'

'কি হয়েছে কি ? কোথায় যাবো ?' ডাক্তার রেগে জিজ্ঞেস করল।

'ছুটো বাচ্চা রাস্তা পার হতে গিয়ে লরি চাপা পড়েছে। আপনি এক্ষুনি এলে ওরা হয়ত বাঁচবে।' একজন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

'আচ্ছা তোমরা আমাকে কি ভাবো বল তো ? আমার কি খেয়ে দেয়ে কোন কাজ নেই ? তোমরা যেখানে বলবে সেখানে, যখন বলবে তখনই, আমাকে ছুটে যেতে হবে ? গ্রামে কি আর ডাক্তার নেই ?' বিরক্ত হয়ে কর্কশ গলায় জগন্নাথম্ বলল।

'কাছাকাছি আর কোন ডাক্তার নেই।' অন্যজন বলল।

'নেই তো হয়েছে কি ? অত যদি মায়া হয়ে থাকে তো কোন সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওনা কেন ? টাই ঠিক করতে করতে জগন্নাথম্ বলল। তার কথা শেষ হতে না হতেই ঝড়ের বেগে আয়া ঢুকল।

'কর্তাবাবু, কর্তাবাবু আপনার বাচ্চা রমেশ আর রাধা দুর্ঘটনায় পড়েছে। খুব চোট পেয়েছে। আপনি তাড়াতাড়ি চলুন।' আয়া বলল।

ডাক্তার যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। রাধা আর রমেশ দুর্ঘটনায় পড়েছে। মুহূর্তে ডাক্তার বেরিয়ে পড়ল। আয়া তাকে যেখানে নিয়ে গেল সেখানে গিয়ে সে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। দেখল তার নিজের দুটি বাচ্চা রমেশ ও রাধা পিচ ঢালা পথের মাঝখানে রক্তের বিছানায় ঘুমোচ্ছে। ওদের সেই ঘুম আর কোন দিন ভাঙ্গবে না। ওরা আর কোন দিন তাকে 'বাবা' বলে ডাকবে না।

এই ঘটনার পর কিছুদিন ডাক্তার জগন্নাথম্ বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানতে পেরেছিল যে রমেশ ও রাধার মৃতদেহ দেখতে দেখতেই সে জ্ঞান হারিয়েছিল। তিন দিন পরে তার জ্ঞান ফিরেছিল। তার স্ত্রী কুসুম ছেলেমেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। মাটিতে হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় চোট পেয়েছিল। তার ফলে দুদিনের বেশি সে আর বাঁচতে পারেনি। কয়েক দিনের মধ্যেই ডাক্তারের আপনজন বলতে যারা ছিল তারা সব হারিয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ডাক্তার জগন্নাথম্ নিজের জীবনকে আগাগোড়া একবার দেখতে লাগল মনের পর্দায়।

জীবনের বিভিন্ন পর্বের বহু ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ডাক্তার নিজের জীবনের সমালোচনা করতে লাগল। এমন কি, এই যে সেদিন বুড়ির ডাকে যায়নি, বুড়ির ছেলের বাড়িতে কান্নার রোল শুনে ভেবেছিল, হয়তো ব্যাটা অক্কা পেয়েছে। তাও তার মনে পড়ল।

তার এইভাবে সমালোচনা করাকে, তার মনে হল অজন্তা হোটেলের মালিক রঙ্গনাথম্, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গোবিন্দাচারি আইনবিদ মহেশ্বরম্ তাকে বিদ্রূপ করছে। ডাক্তার জগন্নাথমের ইচ্ছে করল ঐ নাইটক্লাবটাকে পুড়িয়ে ফেলতে। তার ইচ্ছে করল, ডাক্তারি পেশা ছেড়ে দিতে। সেই মুহূর্তে তার ইচ্ছে করল আত্মহত্যা করতে।

এই ভাবে ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন একমুঠো তেতো বড়ি মুখে পুরে নিল সে। কিন্তু পরমুহূর্তেই অসংখ্য রুগীর আর্তনাদ, আবেদন নিবেদন শুনতে পেয়ে সে সেই বড়িগুলো মুখ থেকে ফেলে দিয়ে মুখ ধুয়ে নিল। তার মনে হল, আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করা যায় না। তার মনে হল, নিরলস সেবার মাধ্যমেই, নিজেকে সমালোচনা করতে করতেই, সত্যিকারের প্রায়শ্চিত্ত করা যায়।

কয়েক মাস পরে ডাক্তার জগন্নাথম্ চেম্বারে ঢুকে কম্পাউণ্ডারকে বলল, 'ফি দু টাকার বেশী নেবেন না। যে আগে আসবে তার নাম আগে টুকে রাখবেন। ওষুধের দাম বেশি নেবেন না।' কম্পাউণ্ডার ডাক্তার জগন্নাথমের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সকালের মৃদু হাওয়া ডাক্তার জগন্নাথমের সাইন বোর্ডের উপর দিয়ে বয়ে গেল।

কুকুরের লেজ

মারুওয়াড়া রাজেশ্বর রাও

'এক প্যাকেট উইলস' বলে টাকাটা ছুঁড়ে দিল রামবাবু। তার পরনে পরিষ্কার ঝকঝকে পোশাক। লেখাপড়া করার জন্য রামবাবু

শহরে থাকে। মাসে মাসে টাকা জমা দিয়েই লেখা পড়ার পাঠ শেষ করে। কারণ দিনে সময় মাত্র চব্বিশ ঘন্টা। তার মধ্যে সিগারেট টানা, সিনেমা দেখা, ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে হটড্রিঙ্কস্ পান করা, প্রেমিকাদের সঙ্গে ঘোরা এবং সুযোগ মত তাদের শরীরের সঙ্গে নিজের শরীরকে একাত্ম করা ইত্যাদি কর্তব্য করতেই তার দিন কেটে যায়। লেখা পড়ার সময় থাকে কোথায়? (আর লেখাপড়া করেই বা হবে কি? অত খাটুনি পোষাবে কেন? সার্টিফিকেটের জন্য তো? সেতো অনেক ভাবে পাওয়া যায়...)।

সিগারেটের প্যাকেট পকেটে পুরে সে দেখতে লাগল, কাছেই খুব চিৎকার করতে করতে ঝগড়া করতে থাকা কয়েকটি মেয়েছেলের দিকে। যেখানে দাঁড়িয়ে ওরা ঝগড়া করছিল সেখানকার মাটি ছিল কর্দমাক্ত দুর্গন্ধযুক্ত। ওদের ঝগড়ার ভাষায়ও দুর্গন্ধের ঝাঁজ ছিল। তাদের অঙ্গভঙ্গীতেও নোংরা ইঙ্গিত।...

হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে কোমরে আঁট করে আঁচল বেঁধে ওরা ঝগড়া করছিল। দুজনেই মাঝ বয়সী। ওদের ঘিরে রয়েছে কয়েকটি মেয়েছেলে, দু তিনটে বুড়ো, আর পাঁচ সাতটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে। ঐ দুটো মেয়েছেলের কাপড় টানাটানি আর চুলোচুলির ফলে দুজনেরই কাপড় ছিঁড়ে গেছে, আর ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে ঝগড়ার আগুনে যেন ঘি পড়ল। তুমুল ঝগড়া করতে করতে হঠাৎ ওরা কান্নাকাটি জুড়ে দিল।

'আমার যে ক্ষতি করবে তাকে এক দিন ঐ ভগবান্ দেখবে। আমাকে ঠকিয়ে তুমি কোঠাবাড়ি বানিয়ে নিতে পারবে না।'

'আমি কারো ক্ষতি করিনি, করবো না। অমন বাপের মেয়ে আমি নই। আমার যখন হবে, আমি দেব।'

'তোমার কাছে তো কোন দিনই থাকে না...আমার ছেলেমেয়েদের পেটে দু দিন ধরে একটা দানা পড়েনি। পয়সাগুলো পেলে খুদকুঁড়ো যা হোক খেতে দিতাম।'

অন্য মেয়েছেলেটা এ কথার জবাবে কিছু বললো না। কী যেন

বলতে গেল কিন্তু তার মুখ থেকে কথা সরল না। তার হয়ে অন্য একটা মেয়েছেলে কথা শুরু করল।

'তা এখন করবেটা কি? ওরও দু দিন খাওয়া-দাওয়া হয়নি। ওর কর্তার শরীর দু দিন ধরে ভাল নেই। তাই কত্তাকে ছেড়ে কাজে বেরোতে পারেনি। এমনিতে ওর মনমেজাজ খারাপ। তার উপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে কি হবে? এখন যাও দেখি। ও পেলেই দিয়ে দেবে।'

একজনকে সাহায্য করার ক্ষমতা ঐ বস্তির কারো নেই। তাই ঝগড়া যখন হয় তখন ওদের কথাগুলো যেন নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণ ঝগড়া করেই ওরা ক্লান্ত হয়ে যায়। তখন ভগবানকে ডেকে অভিশাপ দেয়। দু একজন এগিয়ে এসে ঝগড়া মেটাতে চেষ্টা করে।

'আমায় দুঃখ দিলে তোর মুখে পোকা পড়বে।'

'পোকা আমার পড়বে কেন? পোকাগুলো তোকে কুরে কুরে খাক।'

এভাবে একে অন্যকে অভিশাপ দিতে লাগল। এত যে ঝগড়া তার মূলে আছে পাঁচ দশ পয়সা। ঝগড়া অনেকখানি গড়ানোর পর রামবাবু ঝগড়ার কারণ টের পেয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলল। পাঁচ পয়সার জন্য যে ঝগড়া হতে পারে এ তার চোখের সামনে ঘটলেও সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কান্নার আওয়াজ কানে ঢোকে কিন্তু ক্ষুধার জ্বালার কষ্টটাতো তার পেটে ঢোকে না? তাই রামবাবুর এসব বুঝতে দেরি হয়।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে সে চলে গেল। জ্যৈষ্ঠের রোদ সকাল থেকে চড় চড় করে। তার গলা আর বুকে কিউটিকুরার উপর দিয়ে ঘামের রেখা পড়ছে। ইস্, আর একটু হলে পা ছড়িয়ে বসে থাকা বাচ্চাটার পা মাড়িয়ে দিত। তার পায়ের জুতোর চাপ পড়তে না পড়তেই সে রামবাবুর দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন দগ্ধ করবে তাকে। চার বছরের মেয়ে, গামলার মত পেট, নাকে মুখে সিগ্নি। শোলার মত হাত পা, সারা গায়ে ছোপ্ ছোপ্ কাদা মাটি...তার দিকে একবার রামবাবু তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে 'ডার্টি ক্রিচার' বলে এগিয়ে গেল। মানুষ

যে এত অসহায়, অসহ্য দারিদ্র্যের মধ্যে আছে তা লক্ষ্য করে তার মনের গভীরে একটুও যে বিস্ময় জাগেনি তাও নয়।

ঐ বস্তির কাছেই সারা শহরের আবর্জনা ফেলা হয়। আর ঐ আবর্জনার পাশেই, কখনও কখনও আবর্জনার মধ্যেই, মানুষ ও শুয়োরের বাচ্চারা ঘোরাঘুরি করে। আর তখন এত বেশি দুর্গন্ধ ছড়ায় যে ওরা টের না পেলেও রামবাবুরা ভালভাবেই টের পায়। পথ নামক যে জিনিসটি আছে তার দুপাশে কম্মজাতির লোকের বাস। দুটো ঘরের মাঝের গলিতে একটা লোক ঢোকারও জায়গা থাকে না। ঐ ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকতে পারতো না। আর যা ঢুকতো তা বেরোতেও পারতো না।

প্রচণ্ড রোদে কম্মদের ছাউনির পাতাগুলো শুকিয়ে যেতে থাকে। রোদে পোড়া, জলে ভেজা, শীতে কষ্ট পাওয়া মেয়েরা-ছেলেরা-বাচ্চারা ঐ ঘরগুলোতে বারমাস থাকে। ওখানেই জন্মায়, ওখানেই মরে।

ঐ ঘরগুলোর জানালা নেই, দরজা নেই, খিল নেই, তালা নেই। ওদের লুকোবার কিছু নেই। হারাবারও নেই কিছু। দিন এনে দিন খাওয়া জীবন। যে দিন আনা নেই, সেদিন খাওয়া নেই। পেট ভরে দুবেলা খাওয়া ওদের কাছে এক পরম বিস্ময়।

ওদের ঘরগুলোর গলি পথ দিয়ে রামবাবুর মত যুবকরা যাওয়া আসা করে না। ওদের যাতায়াতের বড় বড় পল্লী রয়েছে, পথ আছে। যে পথে হেঁটে কোন লাভ নেই সে পথে ওরা হাঁটে না। লাভ লোক-সানের হিসাব যারা করতে পারে না তাদের সঙ্গে যোগাযোগ অনেকে রাখে—উদ্দেশ্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লাভ করা।

সে জানে এই সময় সুন্দরাম্মার কর্তা ডিউটিতে যায়। এই সময় সুন্দরাম্মা তার পথ চেয়ে বসে থাকে। কোন এক মধুর স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে রামবাবু আপন মনে হাসল।

মসৃণ গাল...দুধে আলতা গোলা গায়ের রঙ...কাজল কালো চোখ...চেহারাটা তার চোখের সামনে ভাসল। তাকিয়ে থাকার মত... বুকে টেনে রাখার মত আকর্ষণীয় তার রূপ।

সে যে কথাই বলুক না কেন সুন্দরাম্মা খিল খিল করে হাসে। সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে হাসে। সে হাসি নূপুরের ধ্বনির চেয়ে মধুর। এই সব মনে পড়ছিল তার।

অন্যমনস্ক ভাবে শেষ টান মেরে জ্বলন্ত সিগারেটটি বুড়ো আঙুলের উপর রেখে তর্জনী দিয়ে একদিকে ছুঁড়ে অন্য দিকে হন্ হন্ করে চলে গেল রামবাবু। সিগারেট যে কোথায় পড়ল তা সে লক্ষ্য করেনি।

চার পা এগিয়ে ডান দিকে ঘুরলো। আরও কিছুদূর গিয়ে বাঁ দিকের গলিতে ঢুকে গেল সে।

ঐ পাড়ায় দু তিনটে পাকা বাড়ি আর চার পাঁচটা টালির ঘর আছে। বাকি গুলো কুঁড়ে ঘর। একটি কোঠা-বাড়ির পাশে গাড়িবিহীন গ্যারেজে থাকে এক দম্পতি।

সেখানে অনেক লোক জমেছিল। গ্যারেজের দরজা ছিল বন্ধ। ভেতর থেকে কান্না ভেসে আসছিল। নানা ধরনের শব্দ হচ্ছিল ভেতরে। দরজার কাছে এক বুড়ি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছিল, 'ওরে ওকে মেরে ফেলিস্‌নি।.. ওকে মেরে ফেলিসনি বাবা।' ভেতর থেকে তখনও ধপ্ ধপ্ করে শব্দ আসছে। দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেওয়াব শব্দ আর তার সঙ্গে, 'মাগো, বাবাগো, মরে গেলাম গো', আর্তনাদ।

ঘরের জিনিসপত্র ছোঁড়ার শব্দও শোনা যাচ্ছিল। বাইরে বুড়ি বার বার, 'ওরে মেরে ফেলিস্‌নি বাবা', বলে যেন প্রার্থনা করছিল।

গ্যারেজ থেকে কিছু দূরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রামবাবু। সিগারেটে টান মেরে পাশে যাকে পেল তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'ঐ ঘরে যে বউটা থাকে সে নাকি, কর্তা ডিউটিতে গেলে, কার সঙ্গে মজা লোটে। প্রমাণ পেয়ে ওর কর্তা বউটাকে তুলো ধুনো করছে।' হাসতে হাসতে বলল লোকটা।

'যে লোকটা ঐ বউটাকে কুপথে এনেছে সেও ধরা পড়ল নাকি?' ভয়ে ভয়ে আড চোখে তাকিয়ে রামবাবু জিজ্ঞেস করল।

'ওকেই তো আগে ধরে ঠেঙানি দেওয়া উচিত। ঐতো বউটাকে

টাকার লোভ দেখিয়ে খারাপ পথে টেনে এনেছে। আগে ওকেই বেদম মার দেওয়া উচিত।' ঐ লোকটা বলল।

বাইরে থেকে বুড়ির চিৎকার, 'ওকে মেরে ফেলিসনি,' ভেতর থেকে বউটার আর্তনাদ, 'মাগো মরে গেলাম।' এ ছাড়া যে শব্দ ভেসে আসছিল তা হল মাঝের দেওয়ালে মাথা ঠোকার।

রামবাবুর মাথা ভন্ ভন্ করে ঘুরতে লাগল। ভয়ে তার শরীর কাঠ হয়ে যেতে লাগল। সামনে যাওয়ার সাহস ছিল না। পিছু হটার শক্তি ছিল না তার। সে ভয়ে ঘামতে ঘামতে ভাবছিল, 'সুন্দরাম্মাকে ফেলবে নাকি!'

যদি মেরে ফেলে···ওর আর সুন্দরাম্মার মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে... তা যদি ফাঁস হয়ে যায়···পুলিশ...সন্দেহ...জিজ্ঞাসাবাদ...কেস...'ওফ্··· মাগো', বলে রামবাবু আর্তনাদ করে উঠল।

'না, ফেলবে না। মেরে ফেললে তো ওর কর্তাই জড়িয়ে পড়বে। শাস্তি যা হওয়ার তারই আগে হবে। না না আমার কিছু হবে না...বলা যায় না, হতেও পারে। মার খেতে খেতে সুন্দরাম্মা সব বলে ফেলবে না তো? না, বলবে না। আর বললেই বা কী বলবে? সে তো তার আসল নাম ঠিকানা কিছুই জানে না। আর এক মুহূর্তও আমার এখানে থাকা উচিত নয়। এত ঘামছি যে, যে কোন লোকের নজরে পড়ে যেতে পারি। এই সব ভাবতে ভাবতে সে পাশের গলিতে ঢুকে, দূরে কারো চোখে না পড়ে, এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে গ্যারেজের দিকে তাকিয়ে রইল।

বুড়ি তখনো ঐ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে গ্যারেজের সামনে দাঁড়ানো লোকগুলো একে একে সরে গেল। আরও মিনিট পনের পরে গ্যারেজের দরজা খুলে সুন্দরাম্মার কর্তা ভেতর থেকে বেরুল। তার চোখে মুখে রাগের চিহ্ন। শরীরে ক্লান্তির ছাপ। সোজা কোথায় হেঁটে চলে গেল।

রামবাবুর বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। বুড়িটা গ্যারেজের

ভেতর ঢুকল। রামবাবু কান খাড়া করে আছে। সুন্দরাম্মার মৃতদেহ দেখে বুড়িটা নিশ্চয় বুক চাপড়ে কাঁদবে। কয়েক মুহূর্তের কঠিন নীরবতা। রামবাবুর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ঘাম ঝরছে তো ঝরছেই। তার শরীরটা ক্রমশ হিম হয়ে আসছে।

না, এতক্ষণ যখন বুড়ি কাঁদেনি, সুন্দরাম্মা নিশ্চয় মরেনি। একবার দেখে আসলে হত। রামবাবু ভাবল কিন্তু তার পা সরল না। যাই হোক, সুন্দরাম্মা মরেনি, এই যথেষ্ট। কথাটা ভেবে রামবাবু সাহস পায়। যে পথ দিয়ে, সে এসেছিল সেই পথ দিয়েই ফিরে যেতে লাগল।

ফিরতে ফিরতে ঐ অঞ্চলের মানুষের কথাবার্তা, মেয়েদের ঝগড়া, বাচ্চাদের কান্না, বড়দের খিস্তি এই সব ঘুরে ফিরে তার মাথায় তোলপাড় খাচ্ছিল। কুঁড়েঘরের লোকের জীবন যে এত ভয়ঙ্কর, এমন বীভৎস তা রামবাবু আগে জানতো না।

সেই মুহূর্তে ওদের কথা ভাবতে ভাবতে, ওদের প্রতি তার মনে দয়ার ভাব জাগল। ওদের জন্য তার মনে একটু দুঃখ হল। সে ভাবল, ওদের অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।

পরক্ষণেই তার মনে হল, ক্রিকেটে অন্ধ্রের খেলোয়াড়রা ভীষণ পেছিয়ে আছে। কী করা যায়, তা নিয়ে ভাবা, তার কাছে আরও জরুরী মনে হল। হঠাৎ মনে পড়ল 'ভেঙ্গলাপ্পা একাদশের' গোল-কিপারটা তেমন স্মার্ট নয়। উপরের বল উড়ে গিয়ে ধরতে পারে না। সেই সময়ে তার পায়ে যেন ঝিঁ ঝিঁ ধরে। চোখের সামনে এভাবে একটা দল নষ্ট হওয়ায় সে মনে মনে দুঃখ পেল।

ক্রিকেট চুলোয় গেলে অথবা ফুটবল জাহান্নামে গেলেও তার কিছু যায় আসে না। তবু গরিব দুঃখীদের দেখে দুঃখ হওয়ার মত এসব ব্যাপারেও তার দুঃখ হয়। এটা তার অভ্যেস। এই অভ্যেস থাকার ফলে কোন ব্যাপারেই সে মনে বেশিক্ষণ ব্যথা পায় না।

তাই চোখের সামনে এতগুলো মানুষের দুরবস্থা দেখে ওদের জন্য ভাবতে ভাবতে তার ভয় করতে লাগল।

দূরে আগুন! পাতার ছাউনিতে আগুন!

ঝুঁড়ে ঘর আর পাতার ঘর জ্বলছে। ঘরগুলোকে আগুন গ্রাস করছে।

'আরে-রে কি সর্বনাশ'! বলে ঐ আগুনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল রামবাবু। সারা তল্লাটে 'আগুন আগুন' বলে ছোটাছুটি লেগে গেছে। আর্তনাদ, কান্না, বুক চাপড়ানি ইত্যাদি। একটা ঘরের এক বউ আর তার তিনটে বাচ্চা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তার পাশের ঘরে এক বুড়ি বেরুতে না পেরে পুড়ে মরে গেছে। 'কি সর্বনাশ করলে ভগবান! হে অগ্নিদেবতা, মাথা গোঁজার ছাউনিটুকুও পুড়িয়ে ফেললে?' আগুন আর হাওয়া চাকার মত ঘুরতে ঘুরতে একের পর এক ঘরের ওপর দিয়ে তীব্র বেগে চলে যাচ্ছিল।

হাজার হাজার অগ্নিকণা উড়ছে বাতাসে। আগুনের কাছে যারা যাচ্ছিল তাদের গায়েও স্ফুলিঙ্গ পড়ছিল।

'ও মাগো, আমার কচি মেয়েটা পুড়ে গেল গো! মেয়েটাকে আনতে গিয়ে ও যে আর ফিরছে না গো! আমার কপাল পুড়লো গো।'

প্রায় প্রত্যেকটা ঘরের সামনে কেউ না কেউ কাঁদছে, বুক চাপড়াচ্ছে। গো'টা তল্লাটে আর্তনাদ, চিৎকার আর কান্না।

প্রশ্ন উঠল, কী করে আগুন ধরল? ওদের ভেতর থেকে একজন বলল, 'কে যেন একটা জ্বলন্ত সিগারেট কন্মদের চালায় নাকি ছুঁড়েছিল। ঐ কন্মদের চালায় আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে দেখতে পায়। দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে, আগুন দেখাতে দেখাতে, কাঁদতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ঐ ঘরের লোক বাচ্চার কান্না শুনে বেরিয়ে আসে। ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গোটা চালাতেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর ঝড়ের বেগে একটার পর একটা ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল।'

পাড়ার ভদ্রলোক ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, 'জল ঢালছো না কেন?'

'জল কোথায়? এক ফোঁটা জল নেই। দুটো কলই অকেজো।'

'ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দাওনি কেন? ফোন করলেই আসবে।'

রামবাবুর বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটি যে সে, অন্যমনস্ক ভাবে, ছুঁড়েছিল তখন সে কথা তার মনে পড়ল। মনে পড়তেই বুকটা মোচড় দিল। তার মনে হল হয়তো ওরা কোন না কোন ভাবে জেনে যাবে।

লোকটা তখনও বলে যাচ্ছে। 'কোন কি আর ধারেকাছে কোথাও আছে বাবু? সে অনেক দূরে। আর ফোনে আমাদের কথা বলতে দেবেই বা কেন? তবু ছোটাছুটি করে ছেলেরাতো গেছে। ফোন করতে পারবে কিনা ওরাই জানে।'

চারদিক আগুনের হাওয়া, স্ফুলিঙ্গ আর ধেঁায়ায় ভরে গেছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে আগুন আর ধেঁায়া উপরের দিকে উঠছিল।

সিগারেট...সিগারেট...দেশলাই···ঘর...পাতার...ছাউনি··· আগুন ভাবতে ভাবতে রামবাবুর মাথা ঘুরতে লাগল। সামান্য এক টুকরো জ্বলন্ত সিগারেটের জন্য···তাব অন্যমনস্কতার জন্য অতগুলো বুড়োবুড়ি ছেলেমেয়ে পথে বসল! আগুনটা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, যেন ইচ্ছে করেই কেউ শুকনো পাতার আবর্জনায় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে।

একটা বিরাট অপরাধ করার জ্বালায় দুঃখে সে ক্রমশ কুঁকড়ে যেতে লাগল। আবার ভয়ও ছিল তার মনে। পাছে লোকে টের পেয়ে যায় তার অপকর্ম। অজান্তে যে ভুল করে ফেলেছে তার ফল সে চোখের সামনে দেখছিল। তার চোখের আড়ালে এবং তার সজ্ঞানে করা অপরাধের ফল যে কতদিকে ফলছে তা সে টের পায় না। তার কৃতকর্মের ফলে কত যে ঘর ভাঙছে আর মন পুড়ছে তাও সে জানে না।

সেই মুহূর্তে তার কিছু একটা করতে ইচ্ছে করছিল। এমন কিছু যাতে ঐ কম্ম জাতের লোকেরা উপকৃত হয়। নিজের ভুলের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয়। পাগলের মত সে ভাবতে লাগল কি করবে।

হঠাৎ কি খেয়াল চাপল আর পাঁচজন ব্যাটাছেলের মত সেও আগুন লাগা ঘরে ঢুকে গেল। ওরা যা করছিল সেও তাই করতে লাগল। মেয়েদের আর বাচ্চাদের আগুন পোড়া ঘর থেকে টেনে টেনে এনে এক

জায়গায় রাখছিল। জলন্ত ঘরের আগুন যাতে পাশের ঘরে না যায় তার চেষ্টা করছিল। বাঁশ দিয়ে চালা ভাঙছিল। সেই মুহূর্তে রামবাবুর মনে অনেকখানি সাহস শক্তি এবং আগ্রহের মিলন ঘটেছিল। মেয়েরা বলাবলি করতে লাগল, দেখ রাজপুত্তুরের মত ছেলেটা আমাদের মত গরিবদের কিভাবে সাহায্য করছে। ওদের টুকরো টুকরো কথা রামবাবুর কানে আসছিল। কী দারুণ মাদকতা ছিল ঐ কথায়।

রামবাবুর হাত দেওয়ার পরে আরও দশটি ঘর পুড়ল বটে কিন্তু সে হাত না দিলে হয়তো বারটি ঘর পুড়তো।

ওদের প্রশংসার কথা শুনে রামবাবু আনন্দে আরও ফুলতে লাগল। এত আনন্দ যে সে পুড়ে যাওয়া ঘর, মৃত মানুষ, আধ পোড়া মেয়েদের ভুলতে লাগল। ভাল ভাল কথাগুলো কানে ঢুকে এক একটা বেলুন হয়ে রামবাবুকে উপরের দিকে তুলতে লাগল। ভবিষ্যৎ দেশ নেতার এক উজ্জ্বল ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনের আনাচে কানাচে, অজানা ভবিষ্যতের কথা ভেবে, আনন্দের ঢেউ উঠছিল তার মনে। তার মনে হল সে এক বিরাট দেশ সেবা করছে। ত্যাগের মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। হাজার হাজার মানুষ তার প্রশংসা করছে, তাকে আশীর্বাদ করছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে ধ্বনি : শ্রীরামারাও বাবুর কি জয়! শ্রীরামারাও বাবু, জিন্দাবাদ!...'

ভাবতে ভাবতে কম্ম পাড়ার কর্তব্য সেরে কখন যে সে পায়ে পায়ে শহরের মেন রোডে পৌঁছে গেল, তা সে নিজেই টের পেল না। সাইকেল ...গাড়ি...বাঁস...বন্ধু-বান্ধব...তরুণী...চেনা-জানা বড় বড় নেতা... কত মানুষের ভীড়! কী বৈচিত্র্যময় শহুরে জীবন!

এ্যা, জামা-প্যান্টের কি অবস্থা হয়েছে। ধুলো ধোঁয়া ..ইস্ এই জায়গাটা ফুটো হয়ে গেছে? আগুনের কণা বোধহয় পড়েছিল। ভাবতে ভাবতে রামবাবুর মনটা দমে গেল। মাথায় হাত দিয়ে বুঝল চুল যে ভাবে গুছিয়ে আঁচড়ে বেরিয়েছিল সে ভাবে আর নেই। তার মনে হল সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। ভয় করল পাছে চেনা জানা লোক

সামনে পড়ে যায়। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। কয়েক পা যেতে না যেতেই তার এক দল বুজম ফ্রেণ্ডের সঙ্গে দেখা।

ওদের কারো কারো জুলফি অনেক দূর নেবে গেছে। ঘাড়ে চুল এত বেড়েছে যে মনে হয় দু দিন পরে সাধু হবে। নানা রঙের প্যাণ্ট। রকমারি কাট্-ছাঁট্। চোঙা আর বেলবট্‌স প্যাণ্টের ছড়াছড়ি। এসব দেখে যাদের চোখ সয়ে গেছে তারাও মুখ ফিরিয়ে তাকায়। আর যারা প্রথম দেখে তারা বুঝতে পারে না ওদের জামা, ব্লাউজ-পিস দিয়ে তৈরি কিনা। কারো কারো গলায় বীর হনুমান অথবা তিরুপতির ঠাকুর ঠাকুরাণী। জুতোগুলোও বিচিত্র ধরনের। জুতোর উপরের দিকের বাহার দেখে সন্দেহ জাগে জুতোর তলায় কিছু আছে কিনা। এই সব দেখে মনে হয় ওরা পয়সাওয়ালাদের ঘরের ছেলে। (ওদের এই রুচি, এই সংস্কৃতি কোত্থেকে এল, তা জানার জন্য আমাদের আর আমেরিকায় যেতে হবে না।)

রামবাবুর দিকে তাকিয়ে ওরা সব ফ্রিজ হয়ে গেল। মুহূর্তে ওদের চোখেমুখে চরম বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল।

'একি ছন্নছাড়া ভাব তোমার? আমেরিকার রাখালরাও (কাউবয়) এর চেয়ে ভালভাবে বাড়ি থেকে বেরোয়।'

'দারুণ বলেছিস মাইরি পটাশ, একেবারে লাগসই উদাহরণ।' সেই মুহূর্তে খুশী হয়ে সে নিজের হাত দিয়ে যেন নিজের পিঠ চাপড়ে নিল।

'আমার মনে হচ্ছে কোন কয়লাওয়ালির সঙ্গে অনেকক্ষণ রঙ্গ করে এসেছ।' আমেরিকা থেকে আসা হিপিদের মত অভ্যস্ত লম্বা পাঞ্জাবী পরা তার এক যুবক বন্ধু বলল।

'আরে না না, রামবাবু এক্ষুণি কয়লার খনি থেকে উঠে এসেছে।' মুখে পাউডার মাখা বন্ধুটি মেয়েলি গলায় বলল।

বন্ধুদের মন্তব্য শুনে রামবাবু মুহূর্তে দমে গেল। কিছুক্ষণ আগে তার মধ্যে যে মানবতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তা যেন দমে গেল। পরক্ষণেই মনে হল এসব মন্তব্যের জবাবে তারও কিছু বলা উচিত।

ওর নিজের ছুঁড়ে দেওয়া সিগারেটের প্রসঙ্গ চেপে রেখে, আগুন লাগা, আর সেই আগুন নেবানোর জন্য সে যা করেছে তার দশ গুণ বাড়িয়ে বলল। তার অক্লান্ত নির্ভীক প্রয়াসের ফলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে কিভাবে যে কত রকমে প্রশংসা করেছে তাও বলল।

আগাগোড়া চুপচাপ সব কথা শুনে বন্ধুরা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে হাসল। গোঁফের চুল ঠোঁটের ফাঁকে রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল একজন, 'তাহলে চাঁদু, তুমি আজ থেকে সমাজসেবা শুরু করেছ?' পরমুহূর্তে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

গো-গো চশমা ও মেয়েলি ঢঙের জামা পরা যুবকটি বলল, 'রামবাবু নিজেই তুমি তাহলে তালপাতার আগুন নিভিয়েছ?'

সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা ফেল্‌তে ফেল্‌তে একজন বলল, 'মনে রেখো, পরের ঘরের আগুন যারা নেভায় তারা কোনদিন সুখী হয় না।'

'আহা, ও দীনের বন্ধু হতে যাচ্ছে, হতে দাও না ওকে দীনবন্ধু। তবে মনে রেখো বন্ধু, একবার যারা দীনের বন্ধু হয় তারা আর কোনদিন মনে প্রাণে ধনীর বন্ধু হতে পারে না।'

'আরে রাখো রাখো, কত দীনবন্ধুকে দেখলাম, সমাজ-সেবার নামে হাজার হাজার লোককে পথে বসিয়েছে। ধোঁকা দিয়ে মিনিস্টার হয়েছে। ভাঁওতাবাজি করে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হয়ে গুছিয়ে নিয়েছে। চালিয়ে যাও রামবাবু, তুমি এইভাবেই চলিয়ে যাও, একদিন হবে...'

প্রায় একই ধরনের কথা অনেকক্ষণ চলল, তারপর অন্য প্রসঙ্গ এল। বাচ্চা বয়স থেকে যারা ক্ষুধার জ্বালা কাকে বলে জানে না, অভাব কাকে বলে জানে না, তাদের প্রভাবের ফলে রামবাবুর মন ক্রমশ দমে গেল। কিছুক্ষণ আগে তার মনের মাটিতে যে ত্যাগ ও মানব সেবার বীজ পড়েছিল, বন্ধুরা সেই বীজ খুঁড়ে তুলে ফেলে দিল। রামবাবুর সেই মুহূর্তে তার কৃতকর্মের জন্য, লজ্জায় অপমানে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল।...সে মুখ তুলে তাকাতে পারছিল না। তার চোখ ফেটে জল আসছিল।

সূর্য

নিখিলেশ্বর

জ্যোৎস্না রাত। পথের ঐ বিরাট মূর্তির দিকে তাকিয়ে কেন জানি কাম্বুব্রহ্মানন্দ রেড্ডিকে তার মনে পড়ল। মূর্তির কাছে গিয়ে তার নিচের লেখাগুলো পড়া গেল। লেখা ছিল সুভাষচন্দ্র বসু। না জানি কেন সূর্যের হাসি পেল। আজকের নেতাদের কতকগুলো ভড়ং দেখলে সূর্যের হাসি পায়। এরা নিজেরা কিছু না করেই সেকালে যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদের নাম ভাঙিয়ে খায়।

সূর্যের নিজের অবস্থার কথা ভেবেও হাসি পেল। সেই রাত্রে রাজ মাণ্ড্রির সেণ্টাল জেলে বসে কোন এক জানালা দিয়ে আকাশের একটি তারা দেখারও সুযোগ ছিল না, তখন সেই জ্যোৎস্না রাতে দেখা ঐ মূর্তির কথা কেন যে মনে জাগল তা সূর্য নিজেই ভেবে পায় না। সূর্যের নিজের খুব আশ্চর্য লাগল। পরক্ষণেই নিজেকে নিজে বোঝাল এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। মন তো নানা কথা ভাববেই। যে কোন দিন, যে কোন কথা মনে পড়া স্বাভাবিক।

আবার মনে পড়ল সেই রাত্রির কথা। সেই সময় তার ওপর পুলিশের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। গোপনে জীবন কাটাতে হত। বাইরের লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ ছিল না। পথে হাঁটছিল। হঠাৎ মুষল ধারে বৃষ্টি এল। গন্তব্য স্থলে যাওয়া আর হল না। যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল তার কাছাকাছি এক বস্তিতে তার এক বন্ধুর বাড়ি ছিল। মফঃস্বল শহরের বস্তি। ল্যাম্পপোস্টের আলোর ওপর বৃষ্টির ছাঁট পড়ছে। কোনটা জ্বলছে, কোনটা জ্বলছে না। আলো-আঁধারি পরিবেশ। বৃষ্টির জন্যে লোকে ছোটাছুটি করছিল। দেখলে মনে হয় এক্ষুনি যেন কোন

কারখানা ছুটি হল। শ্রমিকরা দেশের উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সূর্যও ছুটছিল। কিছু দুর আস্তে আস্তে ছুটে যাওয়ার পর মনে হল তার পেছনে ছায়ার মতো কে যেন ছুটছে। আড়চোখে তাকিয়ে সূর্য ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করল পেছনের লোকটার ছোটার গতিও বেড়ে গেছে। একটা গলিতে ঢোকার পরমুহূর্তে আমার পেছনের ছায়া আর ছায়া রইল না। সে কায়া হয়ে আমার পিঠে হাত রেখে বলল, 'আপনি কি নকশাল পন্থী?'

'সে কি! এই ধরনের প্রশ্ন করার মানে কি? আমি নকশাল পন্থী হতে যাব কেন?' সূর্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

লোকটা নিজের পরিচয় দিল। সে নাকি স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক। নিজের আইডেন্টিটি কার্ডও দেখাল।

'দেখুন, একজন নকশাল পন্থীর ফটোর সঙ্গে আপনার মুখের ভীষণ মিল আছে। তাই সন্দেহ হচ্ছে। আপনি লুকোবেন না। সত্যি কথা বলুন। আপনি কি নকশাল পন্থী নন? বলুন ঠিক করে।' শেষের প্রশ্ন কঠোর স্বরে বেরিয়ে এল লোকটার মুখ থেকে।

সূর্যও কোনরকম বিচলিত না হয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি ভুল করছেন। আমি এই শহরের একটি পত্রিকার প্রুফ রিডার মাত্র।'

'ও তাই নাকি। পকেটে টাকাকড়ি কি আছে?'

'একটা দশ টাকার নোট আছে।'

'কই বের কর।'

আর কোন কথা না বাড়িয়ে, পকেট থেকে দশ টাকার নোট বের করে ওর হাতে দিয়ে সোজা হাঁটতে শুরু করল সে। লোকটা ছায়ার মতোই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সূর্য মনে মনে ভাবল, যাক বাবা দশ টাকা দিয়ে বিরাট এক ঝামেলার হাত থেকে বাঁচা গেছে। তবে পকেট ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় তার খারাপও লাগছিল। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। সূর্য যে বাড়িতে যাওয়ার কথা ভেবেছিল সে বাড়ির দরজায় আস্তে টোকা মারল, দরজা

খুলতেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভেতরে ঢুকল।

বন্ধুটি দরজা খুলে সূর্যকে দেখে অবাক হয়ে গেল। সূর্য ঘরে ঢুকে বন্ধুকে জানাল যে, সে ঐ রাত্রে সেখানেই থাকবে। কথাটা শুনে বন্ধুটি ভেবে পেল না, কি বলবে। মাথা চুলকে শেষে বলেই ফেলল, 'হঠাৎ এভাবে এসে থাকব বললে কি হয়? এই জায়গা খুব নিরাপদ নয়। তোমার কিছু হলে আমাকেও টান দেবে।'

আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াল না সূর্য। ঘর থেকে বেরিয়েই পা চালিয়ে সে হাঁটতে লাগল। মাঝে একটু বৃষ্টিটা কমেছিল কিন্তু এখন আবার শুরু হল জোরে। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। অগত্যা একটি দোকানের গা ঘেঁষে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই রাত্রে সূর্যের খাওয়া হয়নি, ঘুম হয়নি, পথে পথে তার রাত কেটেছিল।

সূর্যের এ্যারেস্ট হওয়ার পর আজ প্রথম, সেই রাত্রির মতো, মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ছিল। ছোট্ট জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট সূর্যের সেলে ঢুকছিল। তখনই সূর্যের মনে পড়ছিল অতীতের স্নিগ্ধ ও তিক্ত ঘটনা।

আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকার সময় সূর্যকে কত রাত, কত দিন, না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, কাটাতে হয়েছে। কত দিনরাত্রির কত ছবি চোখের সামনে ভাসছে। সূর্য নিশ্চিত, সে যে উদ্দেশ্যে লড়াই করেছে দিনের পর দিন আরও বেশি সংখ্যক মানুষ সেই লড়াইয়ে ঝাঁপ দেবে।

এ্যারেস্ট হওয়ার পর সূর্যের উপর অনেক অত্যাচার করেছিল পুলিশ। বহু প্রশ্ন করেছিল তাকে। কিছুতেই যখন তার মুখ থেকে কিছু বের করতে পারল না তখন তার ওপর আরও বেশি অত্যাচার চলল। এই অত্যাচারের সময় সূর্য অনুভব করেছিল একটি মানুষের শরীর কত অত্যাচার সহ্য করতে পারে। তাকে অত্যাচার করার সময় নতুনদের তার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখত। ওরা যাতে প্রাণের ভয়ে সব কথা বলে দেয়। শরীরের উপর অত্যাচার করার কাজে পুলিশ যে এত উন্নতি লাভ করেছে তা গ্রেপ্তার না হলে হয়তো জানাই যেত না। জানলেও সেই কষ্ট, সেই যন্ত্রণা অনুভব করা যেত না। হাত পায়ের

আঙুলে ছুঁচ ফোটানো থেকে শুরু করে চোখে তীব্র আলো ফেলা পর্যন্ত কত রকমের নিষ্ঠুর পদ্ধতি ওরা প্রয়োগ করে।

জেল হওয়ার পর সূর্যকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল সেই ঘরে তার নিত্য সহচর ছিল ছারপোকা আর মশা। ঘরটায় দিন-রাত অন্ধকার থাকত। টানা এক বছর যখন তখন তাকে কোর্টে নিয়ে যেত। আবার এনে ঐ কোটরে পুরে দিত। বাচ্চা বয়সে সূর্য তার মুসলমান বন্ধুদের কাছে শুনেছিল আসল ছারপোকা হল পুলিশ। জেলে ওদের চেয়ে বড় ছারপোকা আর নেই। দিনের পর দিন কোর্টে নিয়ে যেত। কিন্তু কেসের ফয়শালা হত না। কোর্টে একদিন হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি হত্যা করেছিলে?' সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের জবাব বেরল, 'না।'

সেদিন ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সূর্যের অনেক কথা মনে জেগেছিল। তার মনে হল পৃথিবীর যে কোন দেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে চিহ্নিত হতে হয়। কোথাও তাদের নাম হয় নকশাল পন্থী অথবা শ্রীকাকুলম পন্থী ইত্যাদি। এসব হওয়ার জন্য সে দেশের অবস্থাই দায়ী। সূর্য নিজের চোখে দেখেছে কিভাবে গরিব আরও দিনের পর দিন গরিব হয়ে যাচ্ছে, ধনী হচ্ছে আরও ধনী। ক্ষেতে যারা ফসল ফলায় তারা এক বেলাও খেতে পায় না। যারা কাপড় বোনে তাদের পরিবারের সকলের লজ্জা ঢাকার কাপড় জোটে না। ধনীরা যখন বোতলের পর বোতল মদ খায় গরিব তখন শীতের রাত্রে শিশিরে ভেজে। মানুষের পেটে যে আগুন জ্বলে, সেই আগুনেই সৃষ্ট হয় সত্য সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি। কমিউনিজমের জন্ম এভাবেই হয়েছে।

সূর্য প্রমুখরা অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝল যে, শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থই মৃত্যুবরণ করা। ওদের শোষণের হাত শক্ত করা। বেশিরভাগ নেতাই ভোটপ্রার্থী। কেন যে প্রার্থী শব্দটা ব্যবহার করে সূর্য তা বোঝে না।

স্বাধীনতার স্বাদ এক এক দেশের মানুষ এক এক রকমের পায়। যে শাসন করে তার বিরুদ্ধে যতক্ষণ না কেউ কিছু বলছে, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছে ততক্ষণ তারা ভালো মানুষ।

জমিদারতন্ত্রই হোক আর গণতন্ত্রই হোক বজায় যা থাকে তা হল শোষণ-তন্ত্র। যে কোন দেশের মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবার কখনও সামন্ততন্ত্র বজায় রেখে, কখনও জমিদার তন্ত্রের রূপ ধারণ করে, আবার কখনও গণতন্ত্রের পূজারী সেজে শোষণ করে। তাদের সম্পদ বাড়ায়।

আত্মাপুরমের মস্তবড় জমিদার, যাকে কোটিপতি বলে সবাই জানে, তার নাম গুরুওয়া রেড্ডি। সে যে গ্রামের কত মহিলার গলা থেকে মঙ্গলসূত্র ছিঁড়ে ফেলেছে, তাদের স্বামীকে হত্যা করেছে তার হিসেব নেই। তার কৌশলের ফকে গ্রামের কারও হাতে আর এক ছটাক চাষের জমি রইল না। তার সারা জীবনের ইতিহাস প্রবঞ্চকের ইতিহাস। তার সারা জীবনের অপকর্ম কোন তুলাদণ্ডে ওজন করা যায় না। এহেন জঘন্য, গ্রামের কলঙ্ক গুরুওয়া রেড্ডিকে গাঁয়ের কিছু কৃষক, গোপনে ঠিক করল, বধ করবে। সেদিন রাত্রি···

সমস্ত গ্রাম কাঁপিয়ে ফাটতে লাগল কয়েকটি হাতবোমা, যারা গুরুওয়া রেড্ডিকে ঘৃণা করত তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। যারা গুরুওয়া রেড্ডিকে মনে মনে অভিশাপ দিত অথচ তার সামনে দাঁড়াতে সাহস করত না তারা দরজার আড়ালে এবং জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ঘটনা লক্ষ্য করতে লাগল। কয়েক পুরুষ ধরে গ্রামের যারা বঞ্চিত হয়ে আসছিল গুরুওয়া রেড্‌ডিদের হাতে, তারা একে একে প্রতি-শোধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। আস্তে আস্তে সবাই জড়ো হয়ে, পুঞ্জীভূত আক্রোশে, গুরুওয়া রেড্‌ডির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গুরুওয়া রেড্‌ডির বন্দুক আর তার গুণ্ডা বাহিনী, কেউ তাকে বাঁচাতে পারল না।

সেদিনের সেই রাত্রির কথা ভাবতে আজও সূর্যের ভাল লাগে। গুরুওয়া রেড্‌ডির মৃত্যুর জন্য আজও সূর্যের মনে একটুও অনুতাপ জাগে না। এবং তারই ফলে সূর্যকে পুলিশের হাতে পড়তে হয়েছে। ঐ খতমের জন্যই সূর্যকে পুলিশের নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। তবুও সূর্যের মনে এক মুহূর্তের জন্য আক্ষেপ জাগে না। তার মন অনুতপ্ত

হয় না। হয়তো তার জীবনের এই পরিবর্তনের জন্য কিছু বন্ধুকে হারাতে হবে। তবে সূর্যের বড় আশা, কাল হোক, পরশু হোক, সে তার হারানো বন্ধুদের তো পাবেই, উপরন্তু বহু নতুন বন্ধু তার পাশে জড়ো হবে।

মাঝে মাঝে জেলখানার ঐ অন্ধকার খোপরে বসে ছেলে-মেয়ে আর বউয়ের কথা তার মনে পড়ে। তার জন্য তাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে।

সূর্যের মনে পড়ল এক উপন্যাসের কথা। ইংরেজী উপন্যাস। নামটা ঠিক তার মনে পড়ছিল না। ঐ উপন্যাসের একটি অংশ সে ভুলতে পারে না। নায়ক জাস্টিং নিজের স্ত্রীকে দেশের মুক্তির স্বার্থে অদ্ভুত এক অনুমতি দিয়েছিল। দেশের মুক্তির স্বার্থে ইংরেজদের খপ্পর থেকে কিছু রহস্য আদায় করার প্রয়োজন ছিল। জাস্টিং তার স্ত্রীকে অনুমতি দিল তার সেক্স অস্ত্রের প্রয়োগের মাধ্যমে সেই রহস্যের সন্ধান করতে। তার স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ মতো কাজ করল। নিজের সেক্সের লোভ দেখিয়ে, নিজের দেহ দান করে, সে কাজ আদায় করতে পারল। দেশের স্বার্থে সবকিছুই করতে হতে পারে। সূর্য মনে মনে ভাবল।

এই কোর্ট, বিচারকরা তাকে যে শেষ পর্যন্ত কি শাস্তি দেবে তা সূর্য জানে। এই কোর্টে, বিচারক এবং বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে সূর্যের মনে কোন মোহ নেই। সূর্য জানে কোর্ট শোষকদের যন্ত্র। যেমন যন্ত্র পুলিশ। পুলিশ যত লোককে পথে ঘাটে গুলি করে মেরেছে তার বিচার কি কোর্ট করেছে? আর কোর্ট যাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে তার মধ্যে কতগুলোর ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছে? মাঝে মাঝে বড় বড় পত্রিকাগুলো কত সুন্দর সুন্দর গল্প ফেঁদে, সাধারণ মানুষের মনে এই বিশ্বাস জাগানোর চেষ্টা করেছে যে, কিছু লোক পুলিশকে আক্রমণ করেছে। পুলিশ জীবন রক্ষার্থে গুলি চালিয়েছে।

পরের দিন সকাল। খাওয়ার ঘণ্টা পড়ছে। সবাই ছুটোছুটি করে বাটি নিয়ে লপ্‌সি নিতে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়েছে। ধারে কাছেই পাহারাদাররা বসে বসে আড্ডা মারছিল। কোন কোন কয়েদীর খাবার

নেওয়া এবং খাওয়া হয়ে গেছে। কারও খাবার নেওয়া বাকি আছে। খাওয়ার পরেই সবাইকে লকআপে যেতে হবে।

জেলে সূর্যের শরীর রোগা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বসে থাকা পুলিশদের একজনের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে সে ছুটল। পরক্ষণেই পাগলা ঘন্টা বেজে উঠল। ছুটতে ছুটতে সূর্য যেদিকে যায় সেদিক থেকেই বুটের শব্দ ভেসে আসে।

একসঙ্গে অনেকগুলো গুলির শব্দে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। তার আঙুল ট্রিগারে পৌঁছতেই তার দেহ মাটিতে পড়ে গেল। মাটি ভিজে গেল রক্তে। সূর্যের বাঁ হাত শক্ত করে মাটি ধরে রইল। ডান হাতে ধরা ছিল বন্দুক। আকাশের সূর্য যেন পুলিশদের উপর আগুনের বল্লম ছুঁড়ছিল।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই

শ্রী শ্রী (শ্রীরঙ্গম শ্রীনিবাস রাও)

আজকে এক পকেটমার আমার পকেট কেটে দিয়েছে। ঠিক এই কারণেই লোকে আমাকে প্রায় বলে, 'তুমি গল্প লিখতে পারো না।' তা তো বটেই। কবিতা লিখব গান লিখব, খুব জোর গীতিনাট্য পর্যন্ত লিখতে পারি, কিন্তু গল্প লিখতে যাওয়া উচিত নয়। ইদানীং আমার গানেও নাকি সেই ঢলঢল ভাব নেই। অভিযোগ তুলেছে সিনেমার প্রডিউসাররা। তবু যে দুটো ছবিতে আমি গান লিখেছিলাম সেই 'মানুষুলু মারালি' (মানুষকে বদলাতে হবে) এবং 'দেশামান্টে মানুষুলোই' (দেশের অর্থ মানুষ) ছবির গান লোকের মুখে মুখে ঘুরছে। এ কথার জবাবে ওরা বলে, 'ও দুটো ব্যাপার আলাদা।' এর

পর আমি আর কি বলব ?

এক ছিল রাজা। ঐ রাজার ছিল সাতটি ছেলে। সাত ছেলে মাছ ধরতে গিয়ে সাতটি মাছ ধরে ফিরল। এই গল্পের মধ্যে কোন বস্তু আছে ? মানে ট্রেন, বাস, চোর পকেট ? নেই। থাকতে পারে না। কি জানি যদি থাকে, খোঁজ করে দেখা যাক।

আজ ১৯৭০-এর ১৫ই অক্টোবর। সময়টা ঠিক মনে নেই। তবে রোদ ক্রমশ কড়া হচ্ছে। মাম্বলম যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছি। বেরিয়ে পড়েছি। এমন সময় দুটো চিঠি এলো। একটা কাওলি থেকে। লিখেছেন রমণা রেড্ডি। সেটা ছিল কার্ড। ভদ্রলোক প্রগতিশীল লেখক। আর খাম এসেছে বাঙ্গালোর থেকে। আমার কবিতা নাকি কন্নড ভাষায় অনূদিত হবে। আমার অনুমতি চেয়েছে। খামটা না ছিঁড়ে আমি জানলাম কি করে ? তাই আমার লেখা উচিত ছিল আগে খাম ছিঁড়েছি তারপর চিঠি পড়েছি। পথে বেরিয়ে পড়লাম। রমণা রেড্ডির চিঠি পড়তে যাচ্ছি এমন সময় ১২বি এসে গেল। এটাই কোডাম্বাক্কাম যাবে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। জানলার ধারে কোন সীট নেই। অন্য সীটে বসতে গেলাম। কার্ড ভাঁজ করে পকেটে পুরে রেখে দিলাম। বাঙ্গালোরের চিঠিটাও পকেটেই রইল। বাস চলেছে। বাঁ পকেটে একশ টাকার নোট আছে আর আছে কলম।

কণ্ডাকটার এলো। পকেটে টাকাগুলো বের করে এক টাকার নোট ওর হাতে দিয়ে একশ টাকার নোট ভাঁজ করে কার্ডের ভাঁজে রাখলাম। কণ্ডাক্টারকে বললাম, 'মাম্বালম পাওয়ার হাউস।'

কণ্ডাক্টার প্রথমে টিকিট দিল তারপর পয়সা। টিকিট এবং খুচরো বাঁ পকেটে রেখে কার্ডটাকে (যে কার্ডের ভাঁজে একশ টাকার নোট রেখেছিলাম) ডান পকেটে রাখলাম। এ সবকিছু আমার কাছে দাঁড়ানো একটা লোক দেখছিল। আমি তা লক্ষ্য করেছি। ভাবলাম, ও কি আর বুঝতে পেরেছে যে ওটা একশ টাকার নোট। বাস চলেছে। যারা ওঠার উঠেছে আর যারা নামার নামছে।

হঠাৎ খেয়াল হল রমলা রেড্ডির চিঠির কথা। পড়লে হয়ত ভালই হত। অথবা বাঁ পকেটের কলমটা ডান পকেটে রাখলেও মন্দ হত না। কিন্তু কিছুই করলাম না। সারা পথ শুধু ভাবলাম, পড়লাম না। চিঠিটা পোস্টকার্ডে হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা থাকতে পারে। কোন বিশ্ব-সাহিত্য সম্মেলন থেকে ভেলুপুণ্ড সাহিত্য সম্মেলন পর্যন্ত। কার্ড হাতে নিয়ে ঐ ধরনের কি যেন দেখেছিলাম। সারা রাস্তা অনেকগুলো সাইন-বোর্ড দেখতে দেখতে গেলাম। তামিল ভাষা আমি ঝট্‌পট্ পড়তে পারি না। হঠাৎ এক জায়গায় ব্রেক কষে বাস থেমে গেল। সবাই বাইরের দিকে উঁকি মেরে তাকাতে লাগলো। আমিই বা তাকাব না কেন? আমিও সিট থেকে উঁকি মেরে তাকালাম। ঠিক সেই সুযোগে একশ টাকার নোটসহ পোস্টকার্ডটাও পকেটমার মেরে দিল।

পকেট হাতড়ে দেখি, কার্ড নেই! দুটো পকেট তাড়াতাড়ি ঘেঁটে ঘুঁটে দেখি নেই তো নেই। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়েও দেখলাম, নেই। এক পকেটে সিগারেটের প্যাকেট অন্য পকেটে দেশলাই আছে। কি করি? এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি, আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে যে লোকটা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সে একেবারে উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। তাকে তামিল ভাষায় গম্ভীর গলায় বললাম, 'সসম্মানে ফিরিয়ে দাও, তা না হলে কিন্তু...'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এন্না, এন্না, এন্না কার্ড?' আমি পোস্টকার্ডের কথা বললাম। স্রেফ অস্বীকার করল সে। আমার মনে হল সে ইতিমধ্যে টাকাসহ কার্ডটা পাচার করে দিয়েছে অন্য হাতে।

তারপর আর কি! কখনো বলছি, 'ড্রাইভার গাড়ি থামাও, কখনো বলছি, কণ্ডাক্টার গাড়ি থামাও!' আবার কখনও আমাকে যারা প্রশ্ন করছিল তাদের জবাব দিচ্ছি। সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে আর যে যার পকেট সামলাচ্ছে। এমন সময় একটা স্টপেজ এল। দু চারজন নেমে গেল। হঠাৎ কার নজরে পড়ল, বাসের পাদানির কাছে একটা

পোস্টকার্ড। কে যেন চিৎকার করে বলল, 'এই তো কার্ড।' কার্ড তুলে দেখি তার ভাঁজে একশ টাকার নোট নেই। একজন চুকচুক করে বলল, 'নিজনা মুয়রুপা পোচ্চা?' (সত্যি নাকি! একশ টাকা গেছে?)

যে আমার পকেট মেরেছিল সে তখনও আমার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। সে যেন আমাকে বলতে চাইছে, 'কি ধরতে পেরেছ আমাকে? পারলে আমাকে কিছু করতে?' তার চোখে কোন ভয়ের ছাপ ছিল না।

আমার হাতে রইল একটি পোস্টকার্ড। পকেটমারদের হাতে রইল একশ টাকার নোট।

এতক্ষণ যা লিখলাম সব চোখে দেখা। এরপর কল্পনা করে নিতে পারি. তারপরে দুই পকেটমার এক জায়গায় মিলিত হল। তাদের মধ্যে এই ধরনের কথা হল:

'কইরে আমার ভাগ কোথায়?'

'ভারি তো পেয়েছি দশ টাকা। হিসেব করলে তুই পাবি পাঁচ।'

তোকে যে মারের হাত থেকে বাঁচালাম। তার জন্য পাঁচ দিবি না। আমি যেন দেখেছি একশ টাকার নোট। তাছাড়া ভদ্রলোক বাসশুদ্ধ লোককে শুনিয়ে বলছিলেন, 'একশ টাকা। মাত্র দশ টাকা ছিল?'

'রাখ তোর একশ টাকার স্বপ্ন। ওসব ভদ্রলোকের বাচ্চাদের তুই চিনিস্ না। তিল হারালে তাল বলে।'

দুদিন পরে আবার একটা ঘটনা ঘটল। কিন্তু তার আগে যে কার্ড ফেলে নেমে গেল সে তার প্রেমিকাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াল। মজা করল। হাত খালি হলে আবার ভীড়ের বাসে ঢুকল।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার ঐ দুজনের মধ্যে দেখা হল। কার্ড ফেলে যাওয়া ঐ পকেটমারটি অন্য পকেটমারকে বলল, 'নাও ধর পঞ্চাশ টাকা। এ শালার যা দিনকাল পড়েছে আর বলার নয়। কোথাও সততা নেই। এই দুর্যোগের দিনে আমাদের মধ্যেও যদি সততা না থাকে তাহলে কলির শেষ হবে। ভগবান জানুক, এখনও দুটো পকেটমার সৎ আছে।'

কবে কোন মহাপুরুষ বলেছিলেন, 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।'

সাদা কালো

কে. অরুণকুমার

জ্যোৎস্না রাত। পূর্ণিমার চাঁদের আলোতে ভরা আকাশ ও মাটি। আমি আর রঙ্গনাথম্ দাওয়ায় বসে নানা দেশের খবর বলাবলি করছিলাম। ওটাকে ঠিক আলোচনা বলা যায় না। আমি কিছু খবর বলছিলাম, ও শুনছিল। ওর প্রশ্ন আমি শুনছিলাম।

রঙ্গনাথমের প্রশ্ন, 'আচ্ছা বাবু, ঐ যে বললেন, ভিয়েতনামে মার্কিনীরা বোমা ফেলেছে, মার্কিন বিমানকে ভিয়েতনামের অল্প বয়সী ছেলেরা মাটিতে নামিয়েছে, মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে ছেলেবা লুকিয়েছে, ওরা কি এই ধরনের জ্যোৎস্না রাত্রে ওসব করত, না অন্ধকার রাত্রে?' শুধু একটি নয়, এই ধরনের অনেক প্রশ্ন। রঙ্গনাথমের প্রশ্নের জবাব দিতে আমি কতকগুলি ঘটনা তাকে শোনাতে থাকি।

সে রাত্রে চিন্নাইয়া চাষী গোয়ালে ঘুমিয়েছিল। চিন্নাইয়ার পেটে সে রাত্রে একটু বেশি তাড়ি পড়েছিল। শুধু সেই খায়নি ওর বউও খেয়েছিল। চিন্নাইয়ার শরীর ছিল ভীমের মত। আর ওর বউ ছিল রোগা পটকা। সীতার মত। রাজ্যহারা রামের বউ সীতার মত। চিন্নাইয়ারও এক ছটাক জমি ছিল না। তাই সেও ছিল বনবাসী রামের মত।

চিন্নাইয়া বলছিল, 'ও আর কি বলব বাবু! সে কালের রাবণ শুধু সীতাকেই নিয়ে গিয়েছিল। নিজের প্রজাদের কোন ক্ষতি করে নি। কিন্তু আমাদের দেশের শাসকরা সীতাকেও না খাইয়ে মারে, প্রজাদেরও মারে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখুন বাবু, এই জ্যোৎস্না রাত্রে ঐ পাহাড় পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন…ঐ কালো কালো পাহাড়, ঐ অতদূর

পর্যন্ত কি অবস্থা ছিল। বনবাদাড় কেটে হাজার হাজার সাপ মেরে এই জমিটা আমরা পরিষ্কার করেছি। চাষ আবাদ করতাম। সেই জমি কেড়ে নিল। পাহাড়ের উপরে উঠলাম। ফাঁকে ফাঁকে জমি খুঁজে কত কষ্টে এক ছটাক দু ছটাক চাষ করতাম। তাও কেড়ে নিল। তেঁতুল বিক্রি করি বলে তেঁতুল-গাছ-প্রতি এক টাকা করে মাসে মাসে আদায় করল। ঘরের চারদিকে দু চারটে শাক আর বেগুন গাছ লাগিয়ে ছিলাম। তার জন্যও চার আনা করে চাইল। দিতে পারি নি। ধার পড়ে গেল। সুদ বাড়তে লাগল। শেষে আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চাইল। আমি বারণ করলাম। তখন ওরা বলল, 'ঠিক মত পয়সা-কড়ি দিতে পারলে থাক, না হলে চলে যাও এখান থেকে। যাই বলুক, আমি আর কি করব বাবু, পয়সা থাকলে তো দেব? খেতে না পেয়ে চোখের সামনে দুটো বাচ্চাকে হারিয়েছি। না খেয়ে, না খেয়ে, চোখ গর্তে ঢুকিয়ে কচি কচি বাচ্চাগুলো কাঠ কাঠ হয়ে কালো পাহাড়ের উপর শুয়ে মরে গেল। কি আর করি। শেষে পেটের ভেতরের বাঘটাকে খাওয়ানোর জন্যে এই কাজ করছি বাবু, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা!'

ওর সব কথা বলা হল না। ওর বউ কথার মাঝে বলল, 'বড় জ্বালা বলে বড় জ্বালা বাবু! বাপের বাড়ি থেকে যা দু-এক কাচ্চা সোনা এনেছিলাম, সব ক্ষুধার পেটে চলে গেল। রুপোর যা দু-চারটে গহনা ছিল তাও ঐ জ্বালা মেটাতে গেল। এখন গলায় রয়েছে এই সুতো। এভাবে বাঁচার কি মানে হয় বাবু? আমাদের চেয়ে বুনো শুয়োরগুলো অনেক ভাল আছে। অন্তত পেট ভরে খেতে পায়। আমাদের পেটে খিদে ছাড়া আর কিছু নেই। পাহাড়-প্রমাণ খিদে। আমরা লেখাপড়া জানি না। ছোট মুখে বড় কথা বলতে নেই। বাবু, কুষ্ঠ রোগ কি শুধু গরিবদের হয়? আমাদের ক্ষেত যারা কেড়ে নিল, আমাদের যারা ঘর-বাড়ি ছাড়া করল, তাদের হয় না? ভগবানের বিচার নেই, বাবু। সারা জীবন আমাদের ধারের বোঝা বইতে হয়। ধার আমাদের গিলে খায়। বাবু শুনছেন? কত আর বলব! বলে আর কি হবে! আমার

সোনার গহনা আর রুপোর গহনা কি আর ফিরে পাবো? আমার পেটের বাচ্চারা কি বেঁচে যাবে? পেট ভরে কি আর খেতে পারো? আমাদের জীবন এই ভাবেই ধুঁকতে ধুঁকতে যাবে। ওর দিকে তাকান, বাবু! কোমরে এক বিঘৎ কাপড় আছে। ওটা ছিঁড়ে গেলে আর নেই।'

তখনও চিন্নাইয়া ঘুমিয়ে পড়ল না। কাঁপতে লাগল।. শীতে কাঁপছিল, না সীতার কাহিনী শুনে কাঁপছিল বোঝা গেল না।

রঙ্গনাথম্ অনেকক্ষণ শুনে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'তাহলে চিন্নাইয়ারা এই ভাবেই ঘরবাড়ি হারিয়ে গোয়ালে রাত কাটাবে? শীতে কাঁপবে? ক্ষুধার ক্ষমতা কত? সর্বগ্রাসী বলে ক্ষুধাকে। তা কি ঠিক?'

'ঠিকই তো। ক্ষুধার ক্ষমতার সীমা নেই। এই ক্ষুধাই আদিম যুগ থেকে মানুষকে বনেবাদাড়ে, পাহাড়ে পর্বতে ঘোরাচ্ছে। এই ক্ষুধাই মানুষকে দাস করে ফেলেছে। দাসেরা মাঝে মাঝে মহাজনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। ঐ রোদে পোড়া শরীর, ঐ ঘাম ঝরা শরীর, ঐ পাহাড়ের মত কালো শরীরগুলোই রাগে জ্বলে উঠবে। অনেক কিছু ওলট পালট করে দেবে। ওদের কাছেই আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে। এই ক্ষুধার মধ্যেই প্রতিরোধের রক্ত আছে। ওদের শরীরের ভেতরে রয়েছে দধীচির হাড়। তাই ক্ষুধা নিজের পথ নিজেই খুঁজে নেবে। জ্যোৎস্না, যে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে, সেও ক্ষুধাকে ভয় পায়। তাই জ্যোৎস্না সৃষ্টি করেছে অন্ধকার।' 'অন্ধকার' শব্দটি শুনলেই রঙ্গনাথমের মনে পড়ে সাপ মাড়ানোর সেই রাত্রির কথা।

আবার বলি, 'অন্ধকার আর একটি ঘটনা মনে করিয়ে দেয়। ছোট্ট ঘর। পুলিশের লক-আপ। রাত জাগিয়ে রাখা মশা। মলমূত্রের দুর্গন্ধে ভরা অন্ধকার রাত্রি। এই অন্ধকার রাত্রেই হাত-কড়া পরেছিলাম। এই অন্ধকারে থাকার অবাধ স্বাধীনতা মানুষ আদিমকাল থেকে ভোগ করে আসছে। ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতিনিধিদের এই অন্ধকারেই সমাধি হয়। আর এই অন্ধকার পাহারা দেবার জন্য রাজ্যের বদমাইশগুলো

রয়েছে। সাহেবদের আমলে যেমন জ্যোৎস্না রাত্রেও অন্ধকার ছিল, সেই অন্ধকার এখনও আছে। এই জেলগুলো তখনকার তৈরি। বড় মাছের পেটে গিয়ে ছোট মাছ যত আলো দেখতে পায়, এই লক-আপেও আছে সেই আলো। মানে ঘুটঘুটে অন্ধকার।'

'এই অন্ধকার জীবন আর কতকাল?' রঙ্গনাথমের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন হঠাৎ বেরিয়ে এলো।

রঙ্গনাথমের মনে কঠিন প্রশ্ন জাগে। সব সময় ওর মনে এই ধরনের প্রশ্ন ও সন্দেহ জাগতে থাকে। বাবা যতদিন বেঁচেছিল, বাইরের জগতের কষ্ট যে কি বুঝতে পারেনি। বাবা মারা যাওয়ার সময় রঙ্গনাথমের মা রামলক্ষ্মী নাম ভুলে গিয়ে "ধনলক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মী" বলে সিন্দুকের দিকে কি যেন দেখাচ্ছিল। ঐ সিন্দুকে ছিল টাকা, সোনা, লোকের বন্দক রাখা গয়নাগাঁটি। রঙ্গনাথম্ রামলক্ষ্মীর ছেলে হলেও তার মনে মাঝে মাঝে অদ্ভুত প্রশ্ন জাগত। এই সিন্দুকের কি দরকার ছিল? এই টাকাগুলো কোত্থেকে এলো? তাই অন্ধকার জীবন বলতে যে কি বোঝায় তা তার পক্ষে সহজে বোঝার নয়। আমিই বা বোঝাই কি করে? অনেক ভেবে দুদিন আগের একটা ঘটনা ওকে বললাম।

এই পরশু দিন রাজমাণ্ড্রি জেলে গিয়ে রামি রেড্ডির সঙ্গে দেখা করে এলাম। হাইকোর্টে সেইদিনই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ বেরুল। আমি রামি রেড্ডিকে বললাম, 'বিশ্বনাথম্‌কে হত্যা করেছ বলে তোমার এত বড় একটা শাস্তি হলো। এখন আমার প্রশ্ন আসলে ঘটনাটা কি, জানাবে?'

রামি রেড্ডি বলল, 'বলে আর কি হবে। আপনার যখন জানার ইচ্ছে জেগেছে, বলি। আমাদের গাঁয়ের নাম কাচ্চুলুরু। গোদাবরীর তীরেই। বন বাদাড় কেটে পাহাড়ের গায়ে আমরা চাষ আবাদ করতাম। সাত পুরুষ ধরে আমরা যত জমি পরিষ্কার করেছি, ঐ বিশ্বনাথম্ জোর করে সব দখল করে নিয়েছে। আমার কাকাকে, ধার মেটায়নি বলে, মার ধোর করে ঐ বিশ্বনাথমের লোক চারদিন অন্ধকার ঘরে বেঁধে ফেলে

রেখেছিল। টাকা আরদিন বাকায় খাওয়া নেই ঘুম নেই। কবে কে টিপসই দিয়ে এক টাকা ধার নিয়েছে সেটা বাড়তে বাড়তে সাত শো আটশো টাকা হয়ে গেছে। শুধু কি বাবু বিশ্বনাথম্? এ ছাড়া আছে বন বিভাগের সরকারী রাঘব বোয়ালরা। জমিদারের জ্বালাও ভয়ংকর। খাজনাতো নেবেই এছাড়া ওর জ্বালায় ছাগল গরু মুরগীও রাখার উপায় নেই। নিজেরাই তুলে নিয়ে যায়। আর বলে, ভেট নিচ্ছি। কত রকমের গালাগাল যে আমাদের খেতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। ওদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এভাবে চলছিল। একদিন শুনি বিশ্বনাথম্ আমার বউকে টান মেরে নিয়ে গেছে। শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল। ছুটে গেছি তার বাড়ি। দু এক কথার পরে হাতের কাছে যা পেয়েছি তাই দিয়ে ওকে আচ্ছা করে মেরেছি। আমাকে দেখে লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আর আমার বউ হাঁউ মাঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল। সোজা গিয়ে সে গোদাবরী নদীতে ডুবে মরল। জানেন বাবু, বিশ্বনাথম্‌কে আমি মেরেছি ঠিক, কিন্তু ও মরেছে ওর পাপের জন্য।'

কিছুক্ষণ পরে বিচারকের সামনে রামি রেড্ডি কি বলল না বলল তা সবিস্তারে জানাল।

'আমি বিশ্বনাথম্‌কে লাঠি দিয়ে মেরেছি। হত্যা করিনি। ওর পাপ ওকে হত্যা করেছে···আমার বউকে ও ন্যাংটো করেছে। অত্যাচার করেছে। ওর অত্যাচারের ফলে আমার বউ গোদাবরীতে ডুবে মরেছে। ভালভাবে বিচার করে আমাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।' বলে রামি রেড্ডি দুঃখ করে বলল, 'আমার কথা শুনে, সাহেবদের আমলে ওরা যে কালো জামা পরেছিল, সেই কালো জামা-পরা লোকগুলো দাঁত বের করে হেসে উঠল। আমার কথা ওদের বিশ্বাস হল না। ওরা সাক্ষী চায়। শেয়াল থাবা মেরে মুরগী ধরে নিয়ে গেছে। তার কি সাক্ষী দেব? বউ গোদাবরীতে ডুবে মরেছে। তার সাক্ষী দেবে কি গোদাবরী? কি বলব বাবু। ইংরেজ সাহেবদের তৈরি করা আইন আমাদের দেশী সাহেবরা

আওড়াচ্ছে। ঐ হলো বনে বাঘের বিচার। ওদের কানে তুলো। চোখে ঠুলি। সাহেবদের আমলের চেয়ারে বসে বিচার করে। ঐ গোদাবরীতে কত যে মেয়েছেলে আমার বউয়ের মত ডুবে মরেছে কে জানে।আমাদের গাঁয়ের পাহাড় তার সাক্ষী। তবে বাবু, একদিন ওদের এর ফল ভোগ করতেই হবে। গোদাবরীর জলে এই পাপ কোনদিন ধুয়ে মুছে যাবে না।'

এসব কথা শুনে রঙ্গনাথম্ বলল, 'তাহলে রামি রেড্ডিদের জন্য কম্যুনিষ্টরা কি এগিয়ে আসবে না?'

আমি বললাম, 'কমিউনিস্টদের মধ্যে যে আবার দুটো ভাগ আছে। সাদা কমিউনিস্ট আর কালো কমিউনিস্ট। সাদারা বলে, শাসক-শোষকদের সঙ্গে থেকে ওদের মন বদলাতে হবে। এবং এইভাবেই ওরা হয় শেষ পর্যন্ত শাসকদেরই বিপদের বন্ধু। আর, কালোরা বলে, সাদারা ভুল করছে। অন্ধকারে যারা পড়ে আছে, এরাই হল সাচ্চা মানুষ, গরিবের বন্ধু, শাসকদের ত্রাস, আমরা এদের জন্য লড়বো। এখন রঙ্গনাথম্, তুমিই বল, তুমি যাবে কোন্‌দিকে?'

ওরা দুজনে

তল্পি রেড্ডি

বিরাট এই ভারতের একটি বড় শহর—ভাগ্য নগরমে প রাখল রামনাথম্। বিরাট বিরাট বাড়ি, লম্বা চওড়া রাস্তা। বৈদ্যুতিক আলোতে ঝলমল। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রামনাথম্ চারদিকে তাকাচ্ছিল। কাঁচের মত স্বচ্ছ শাড়ি পরে মেয়েরা ঘোরাঘুরি করছে। চোঙা প্যান্ট পরা যুবকদের আনাগোনা। বাসের অপেক্ষার ফাঁকে ফাঁকে যা কিছু নজরে পড়ছিল তাই দেখছিল রামনাথম্।

হঠাৎ চৌদ্দ নম্বর বাস এসে গেল। মেয়ে পুরুষের ঠেলাঠেলি, বাসে ওঠার গুঁতোগুঁতি। এর মধ্যেই রামনাথম্‌কেও বাসে উঠতে হয়েছে। বাস ছেড়ে দিয়েছে। হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল, 'থামাও, বাস থামাও'। যাত্রীরা সবাই এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। বাস থামল। কিছুলোক নেমে গেল। ওরা হয়ত আগে নামতে পারেনি। হয়ত অন্য কোন কারণ ছিল। বসার সুযোগ পেয়ে রামনাথম্ খুব খুশী হল। বসার পর যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের দিকে তাকাচ্ছিল সে। কাউকে দেখে মনে হয় অফিস যাত্রী। কারও চোখ মুখে ব্যবসায়ীর ছাপ। এক একজন এত কষ্টে দাঁড়িয়ে আছে যে বলার নয়। ইচ্ছে করছিল উঠে গিয়ে তাকে বসতে দিতে।

বাসের ভেতরের সবকিছু দেখা যেন শেষ। বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ পড়ল 'মালাকাপেটা' সাইনবোর্ডের উপর। এখানেই তার নামার কথা। কিন্তু থামল না কেন? জোরে জোরে জিজ্ঞেস করল, 'মালাকাপেটায় বাস থামে না?'

'আপনি মালাকাপেটায় নামতে চান? আপনার উচিত ছিল আগের স্টপেজে নামা। এটা এক্সপ্রেস বাস। আরও দুটো স্টপেজ পরে থামবে। সেখানে নেমে যাবেন।' পাশের যাত্রী বলল।

তাড়াহুড়োর মধ্যে বাসের বোর্ড না দেখে ওঠায় সব গোলমাল হয়ে গেল। স্টপেজে বাস থামল। রামনাথম্ ও আর একজন বুড়ো লোক নামল। সে বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, 'মালাকাপেটা কোন দিক দিয়ে যাব?'

'সোজা গিয়ে বেঁকে যাবেন।' বলে বুড়ো হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেল।

বুড়োর কথা কিছু বুঝতে না পারলেও সে যেদিকে তর্জনী দেখিয়েছিল, সেদিকেই রামনাথম্ হাঁটতে লাগল। পথের বাতিগুলো টিম টিম করে জ্বলছে। কোন থামে বাল্‌ব আছে কোনটাতে নেই। দূর থেকে যেটা ছোট খাট পাহাড়ের মত দেখাচ্ছিল আসলে সেটা পাহাড় নয়, শহরের

আবর্জনার স্তূপ। পথে ঘাটে পুরোপুরি অন্ধকার নামেনি। সূর্যের আলো যে সেই গ্রামেও পড়েছিল তার প্রমাণ পশ্চিম দিকে তাকালে বোঝা যায়। ঐ আলো আঁধারি আলোতে মাটির ঘর, পাকা ঘর সব এক রকম দেখাচ্ছিল। সোজা হেঁটে পথ যেখানে বাঁক নিল, সেখানে ঘুরতে না ঘুরতেই রামনাথম্‌কে থমকে দাঁড়াতে হল। তার পা আর চলছিল না। এক পা এগোনোরও যেন তার পায়ে ক্ষমতা নেই। পাশাপাশি দুটো গাছের সঙ্গে দুজনকে বেঁধে রাখা হয়েছে। একটি পুরুষ ও একটি মহিলা। আর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো লোক চাবুক মারতে মারতে তর্জন গর্জন করছে। মহিলাটির গা বেয়ে রক্ত ঝরছে। আ-উ কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। হয়ত জ্ঞান নেই।

দেখতে দেখতে রামনাথমের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি ঘটনা। শহরের দুটো লোক তার স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠল। তাদের সঙ্গে, এখন চোখের সামনে যাদের দেখছে তাদের গরমিলের চেয়ে মিল ছিল অনেক বেশি।

তখনও ভারত স্বাধীন হয়েছে বলে নেতারা আমাদের জানিয়ে দেয়নি। পথে পথে, পদে পদে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দোসরদের সঙ্গে লড়াই চলছিল।

রামনাথম্‌ সেই লড়াইয়ের একজন অংশীদার ছিল। ফলে তাকে জেলে যেতে হয়েছিল। জেলে যে ঘরে দশজন থাকার কথা সেই ঘরে পঞ্চাশজনকে পুরে রাখা হয়েছিল।

জেলের জানালা দিয়ে প্রত্যেক দিন রামনাথম্‌ পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। সারাদিনে ঐটুকু সময়ে সে যেন কিছুটা আনন্দের সন্ধান পেত। অন্যদিনের মত সেদিনও সে তাকিয়েছিল। হঠাৎ তার কানে গেল নারীর আর্তনাদ। পাহাড়ের এক প্রান্তে পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করছে একটি মহিলা। একটা সেপাই বেয়নেট দিয়ে তার গায়ের শাড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খুলে ফেলছে। মহিলার গা বেয়ে রক্ত ঝরছে। সেপাইটা দাঁত বের করে হাসছে আর

বেয়নেট দিয়ে মহিলার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় খোঁচা মারছে।

সেই মর্মান্তিক করুণ দৃশ্য দেখতে দেখতে মাথা ঘুরে পড়ে গেল রামনাথম্। পড়ে যাওয়ার মুখ্য কারণ বোধ হয় এই যে মহিলাটি ছিল তারই স্ত্রী। তারপর কি হল রামনাথম্ কিছুই জানে না। যখন জ্ঞানার মত সময় হল তখন ছ মাস কেটে গেছে।

সেদিন যে দৃশ্য দেখে রামনাথম্ জ্ঞান হারিয়ে ছিল, আজকের দৃশ্যের সঙ্গে যেন তার অনেক মিল আছে।

হঠাৎ একটি গাড়ি থামার শব্দে রামনাথমের চিন্তায় ছেদ পড়ল। রক্তাক্ত জ্ঞানহারা মহিলাকে এবং একই অবস্থার পুরুষকে টানতে টানতে ওরা গাড়িতে তুলল। গাড়ি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আশ-পাশের বাড়ি থেকে লোকজন বেরুল। সকলের চোখে-মুখে কান্নার ছাপ।

কি যে হল, কেন যে ওরা এতক্ষণ ঘরেই ছিল, কেউ বেরুল না, গাড়ি চলে যেতেই সবাই বেরুল, এসব জানার জন্য রামনাথম্ ধরে ধরে অনেককেই জিজ্ঞেস করল। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ মুখ খুলল না। শেষে একজনকে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'এত ভয়ের কি আছে। কেউ কিছু বলছ না কেন?'

তখন সেই লোকটা আমতা আমতা করে বলল, 'আপনাকে বললে বড়বাবু আমাদের মেরে ফেলবেন।'

'কে তোমাদের বড়বাবু? কোন বড়বাবু তোমাদের কিছু করতে পারবে না। বল তুমি আমাকে। ওদের কেন মেরেছে? কি ওদের অপরাধ? কোথায় ওদের নিয়ে গেছে?' রামনাথম্ জিজ্ঞেস করল।

'দীপাবলী থেকে আমরা ছ টাকা মজুরীর দাবী করেছি। আমাদের দাবী পূরণ করেনি। তাই আমরা পাঁচদিন ধরে কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। সেই জন্যেই আমাদের নেতা এবং তার বউকে ওরা এইভাবে মারধোর করে নিয়ে গেছে।' লোকটা বলল।

'তাহলে তোমরা ঘরে বসে আছ কেন? এর বিচার চাই বলে দাবী তোল। বিচারের আবেদন কর। তোমাদের যে সাহায্যের দরকার হবে

তা আমি দেব।' রামনাথম্ বলল।

'আর আপনাদের কোন সাহায্যের দরকার নেই বাবু, আমাদের মত আমাদের থাকতে দিন। না হলে আমরা মারা পড়ব।'

রামনাথম্ কত করে বোঝাল। কিন্তু বিচারের জন্য কেউ কোথাও যেতে রাজী হল না। ওদের উপর ভীষণ বিরক্ত হয়ে সে মনে মনে বলল, 'যা ব্যাটা, আমার কথা শুনবি না তো মর। তোদের উপর দিয়ে শোষণের রথের চাকা আরও অনেক বছর চলবে। আশ্চর্য, এত করে বললাম তবু কোর্টে যাবে না!'

পরের দিন রামনাথম্ একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় ছোট্ট খবর দেখে থ বনে গেল। তাতে ছাপানো ছিল: বস্তি বাসীর স্ত্রীর কুয়োতে পড়ে আত্মহত্যা। পুলিশী সূত্রে খবরে প্রকাশ যে...

কাগজ পড়ে তাড়াতাড়ি ওদের কাছে গিয়ে রামনাথম্ বলল, 'দেখলে কাগজে কি লিখেছে? তোমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলে কি আর এই মিথ্যা খবর বেরুত?'

জবাবে ওরা বলল, 'আমরা বেরুতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বড়রা বারণ করেছিল। এবার থেকে আমরা বড়দের কথা আর শুনবো না, বাবু।'

বেতন শর্মার ভূমিকা

রাচকোণ্ডা বিশ্বনাথশাস্ত্রী

মগধ দেশ। প্রাচীন কাল। রাজার নাম সুন্দর সেন। প্রজারা বলত, 'মহারাজা।' মহারাজা সুন্দর সেন ভাল প্রজা পালক ছিলেন। ঐ মহারাজা দেশে যত গম উঠত, তার একশো ভাগের পনের ভাগ কর হিসেবে আদায় করতেন। তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতেন। প্রজারা যাতে ভগবানকে ভক্তি ভরে ডাকে তার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কর যা পেতেন, তার থেকে নিজের জন্য খরচ করতেন। প্রজাদের বিশ্রামের জন্য কয়েকটি বিশ্রাম শালা করেছিলেন। বৈদ্যশালাও করলেন। সৈন্যদের পেছনেও কম খরচ করতেন না। রাণীর প্রসাধন দ্রব্যের খরচও তা থেকে হত। কিছু আবার রাজ পরিবারের গুপ্তধনে রাখতেন। এছাড়া ঐ করের টাকায় মহারাজা সুন্দর সেন যে সব জিনিস কিনে বিক্রি করলে লাভ থাকে বেশি, সে সব জিনিসের ব্যবসাও করাতেন নিজের লোককে দিয়ে। শুধু কি তাই, শালা ভগ্নীপতি থেকে শুরু করে লতায় পাতায় যত আত্মীয় ছিল, প্রত্যেকের যাতে কিছু উন্নতি হয় তার জন্য কম অর্থ খরচ করতেন না। এই ভাবে নানা পদ্ধতিতে করের টাকা খরচ হত। দেশের প্রত্যেক বড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে মহারাজা সুন্দর সেনের ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া ছিল। ব্যবসাদারদের অতিরিক্ত লাভের জন্য প্রয়োজন হলে যখন তখন শতকরা কুড়ি, কুড়ি থেকে পঁচিশ, এমনকি শতকরা তিরিশ ভাগও আদায় করতেন। রাজাদের যখনই অভাব পড়ত, তখনই তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত। ভগবান নাকি প্রজাদের দিকে দেখিয়ে দিতেন। রাজারা অগত্যা প্রজাদের কর বাড়িয়ে দিত।

সেকালের মগধ দেশে আজকের ভারতের মতই অধিক সংখ্যক লোক নিরক্ষর ছিল। রাজারও তাঁর বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সবাই মনের মত কাজ কর্ম করে প্রচুর অর্থ জমিয়ে ফেলেছিল। ওদের পকেটে যত পড়ত, খিদেও বেড়ে যেত তত বেশি। মূলধন বাড়ল, ব্যবসা আরও প্রসারিত হল। লাভের পাহাড় আরও বড় হতে লাগল। অন্যদিকে প্রজাদের কোমর ভেঙ্গে যেতে লাগল করের বোঝা বইতে না পেরে।

তবে আজকের মতই সেকালেই অল্প কিছু লোক লেখা পড়া জানত। রাজার কাজের বর্ণনা ও হিসেব পত্তর রাখার জন্য কিছু লোককে লেখাপড়া শেখানোর দরকার হত। তাই বলে ওদের মাস মাইনে যে বেশি ছিল তা নয়। সুন্দর সেনের রাজত্ব কালে সারাদেশে একবার মহামারী দেখা দিয়েছিল। সেই সুযোগে রাজার বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনরা লাভের পাহাড় আরও বড় করতে পারল। সেইকালে মার্কণ্ডেয় নামে এক

ঋষি ছিলেন। প্রজারা কি ভাবে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে তাঁ মার্কণ্ডেয় নিজের চোখে দেখেছিলেন। সব দেখে তিনি ভাবলেন, রাজার কাজ প্রজারা নিজেদের হাতে না নিলে ওদের এ ভাবেই না খেয়ে মরতে হবে। ঋষি ঘুরে ঘুরে প্রচার করতে লাগলেন, 'রাজাকে কর দেওয়া বন্ধ করে দাও। রাজার কাজ তোমরা কর। এটা ভগবানের আদেশ।'

রাজাও পাল্টা প্রচার করলেন, 'মার্কণ্ডেয় আসলে একটি চোর।' তারপর রাজা অনেক কাহিনী প্রজাদের মধ্যে প্রচার করে দিলেন। প্রজারা যখন মার্কণ্ডেয়র কথা নিয়ে নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আলোচনা করছিল, সুযোগ বুঝে রাজা তাকে হত্যা করালেন। ওঁর মারা যাওয়ার পর রাজা নিজের লোককে নির্দেশ দিলেন, তোমরা লক্ষ্য রেখো মার্কণ্ডেয়র কথা কেউ প্রচার করে কিনা। তারপর রাজা সেনাদের সারা দেশে ছড়িয়ে দিলেন। মার্কণ্ডেয়র কথা আলোচনা করলেই তাকে মেরে ফেলার হুকুম দিলেন। ফলে সারা দেশে সেনাদের অত্যাচার শুরু হল।

রাজার সঙ্গে মার্কণ্ডেয়র মতের বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য কিছু শিক্ষিত লোকও এগিয়ে এসেছিল। এরা কিছুটা বাবু শ্রেণীভুক্ত। এদের মধ্যে বেতন শর্মা নামে একজন ছিল। মার্কণ্ডেয়কে রাজার হত্যা করানোর পর, সারা দেশে প্রজাদের উপর সেনারা অকথ্য অত্যাচার করেও তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারলো না। তারপর ওরা অত্যাচার শুরু করল বেতন শর্মার মত শিক্ষিতদের উপর। সেনাদের ধারণা হল এই শিক্ষিত গাধার বাচ্চাদের উচিত শিক্ষা দিলে, ওরা অশিক্ষিতদের শেখাবে।

এই ধরনের এক চরম সময়ে বেতন শর্মা ঘোষণা করল, 'প্রথমেই আমাদের জানতে হবে "আমি কে?" তারপর জানতে হবে কার কৃপায় আমি পৃথিবীতে এসেছি।'

এ সব কথা রাজার কানে গেল। রাজা বেতন শর্মাকে প্রচার করার সুযোগ দিল। বেতন শর্মা প্রচার করল, 'মার্কণ্ডেয় হয়তো ভাল লোক ছিলেন। মহর্ষিও হয়তো ছিলেন, কিন্তু মানুষের জীবনে প্রথম প্রশ্ন হল, বাঁচার প্রশ্ন। তারপর প্রশ্ন জাগে, কি করে ভাল হব। বাঁচার পথে

যাতে বাধা পড়ে সে রকম কোন্ কাজ আমাদের করা উচিত নয়। এবার ভাবুন তো মার্কণ্ডের আমাদের রাজার কাজের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে কোন্ উপকারটা করেছেন ?'

এই নিয়ে কিছু শিক্ষিত লোক দিনের পর দিন আলোচনা করল।

'মার্কণ্ডেয় চেয়েছিলেন, রাজা যে রাজকাজ করছেন, তার মানে, রাজা যে প্রজা পালন করছেন, সেই কাজ নাকি প্রজাদের করা উচিত। ভাবুন তো', প্রজারা যদি প্রজা পালন করে তাহলে আমাদের মত শিক্ষিতদের কি অবস্থা হবে !' বেতন শর্মা বলল।

আরও কিছুদিন এই নিয়ে শিক্ষিতদের মধ্যে আলোচনা চলল। শেষে বেতন শর্মা রাজার আশীর্বাদ পেয়ে আরও জোর প্রচার শুরু করে দিল, 'মার্কণ্ডেয় সব রাজাদের আর ওদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের এক শ্রেণীতে ফেলেছেন, আর সমস্ত কৃষক ও মজুরদের অন্য শ্রেণীতে ফেলেছেন। আমাদের কিন্তু কোন শ্রেণীতে ফেলেন নি। ফলে আমাদের দেখার আর কেউ নেই। এখন আমাদের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত কি ভাবে রাজাকে বলে কয়ে নিজেদের বেতন বাড়িয়ে নিতে পারি। বেতন বাড়িয়ে দিলে আমাদের দুশ্চিন্তা থাকবে না।'

বেতন বাড়লে কত বাড়া উচিত, জীবনের মান উন্নত করতে হলে বেতনের মাপ কাঠি কি হওয়া উচিত, এই নিয়ে শিক্ষিতদের মধ্যে আবার কিছুদিন আলোচনা চলল। তখন বেতন শর্মা আর একবার অসংখ্য জায়গায় লিখে এবং বিভিন্ন মঞ্চ থেকে জানিয়ে দিল, 'শাসকরা শাসন করে। বড় লোকদের কাঁধে ভর দিয়ে ওরা চলে। কিন্তু বর্তমানে দেশে একটা বিপ্লবের হাওয়া দেখা দেওয়ার আশঙ্কা ওদের মনে জেগেছে। আমরা এই অবস্থার পূর্ণ ব্যবহার করতে পারি। এখনই আমাদের গলা ফাটিয়ে জানিয়ে দিতে হবে, 'আমরা বিপ্লব চাই না, বেতন চাই।'

এই কথা নিয়ে শিক্ষিতদের মধ্যে আবার আলোচনা শুরু হলো। ওদের আলোচনা শেষ হতে না হতেই ওদের বেতনও ছিটে ফোঁটা বেড়ে গেল। বেতন শর্মার মূর্তি গড়া হল স্থানে স্থানে।

তারপর একদিন চাষি মজুরদের সমস্যা মেটানোর জন্য বেতন শর্মার ডাক পড়ল। চাষি মজুররা মালিককেও নমস্কার করে, বেতন শর্মাকেও নমস্কার করে। মজুরদের সমস্যা মেটাতে বেতন শর্মাকে কে কে ডাকল তা আজও বহু মজুরের কাছে অজানা রইল।

চাষি মজুরের আন্দোলনের ক্ষেত্রে বেতন শর্মার আগমন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ বেতন শর্মার বেতন-নিয়ে, বেতন বাড়ানোর আন্দোলন করে, বিপ্লব ঠেকানোর চেষ্টা করতে লাগল। মালিক পক্ষের নেতারা প্রচার করল, 'চোরা কারবারী ও মুনাফা খোরদের জন্য ভাল কাজ করা যাচ্ছে না? লোকতন্ত্র বিপন্ন।' আর বেতন শর্মারা ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে লাগল, 'বড় লোকদের পোষা কুকুরগুলো যখন তখন মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। লোকতন্ত্র বিপন্ন!'

চোখের সামনে

ভি. শ্রীহরি

'রাজুবাবু! রাজুবাবু!' দু দুবার এই শব্দটা শোনা গেল। এই ডাক কানে যেতেই আমার শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেল।

'কে?' আমার বউ প্রশ্ন করল।

কোন জবাব শোনা গেল না। বুকের ধড়ফড়ানি আরও বেড়ে গেল।

১৯৬৫ সাল। দেশে তুলকালাম কাণ্ড চলছে। অনেকেই জেলে যাচ্ছে। তাদের জেলে পাঠানোর আইন আছে। প্রিভেনটিভ ডিটেন্‌শান্‌ আইন। দেশ শাসনের ভার যাদের উপর তারাও জানে না কখন কি করতে হবে। বিচারের বাণী দেয়ালের দিকে মুখ রেখে মাঝে মাঝে নীরবে নিভৃতে কাঁদছিল। একটা দিন গেলে, মনে হত, একটা যুগ পেরিয়ে এসেছি। 'সত্যের জয়' কথায় কথায় পরিণত হল। সত্যকে হত্যা করার

প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। অন্ধকারকে মানুষ ভালোবাসে না। কিন্তু আলোও পাচ্ছে না। যেকোন রাত্রেই যেকোন বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যেত। ভয় অন্ধকারে ডানা মেলে যেখানে সেখানে চলে যেত। গোটা পাড়ায় থমথমে ভাব। এই রকমের এক সময়ে বাইরে থেকে শোনা গেল সেই চিৎকার। চিৎকার নয়, বলা উচিত ডাক। অচেনা কণ্ঠস্বরের আর্তনাদ যেন। কিসের ডাক, কে ডাকছে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

বউ, ললিতা দরজা খুলল। বলল, 'পুলিশ নয়।' বিরাট বোঝা মাথা থেকে যেন নেমে গেল। বাইরে এলাম। দানাইয়া নমস্কার করল। পাল্টা নমস্কার করার প্রয়োজন হল না। মনে প্রশ্ন জাগল সরাসরি পুলিশ না এসে এর মাধ্যমে কাজ সারতে চাইছে না তো? দিনকালের অবস্থা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কখন যে কে কোন্ উদ্দেশ্যে কি করছে সহজে বোঝা যাচ্ছে না। দানাইয়া যদি পুলিশের খপ্পরে পড়ে থাকে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

'রাজুবাবু', দানাইয়া এমনভাবে বলল যেন কথাটা তার মনের অনেক গভীর থেকে উঠে আসছে।

'কি ব্যাপার?' নির্বিকার নির্লিপ্তভাবে প্রশ্ন করলাম।

'আমরা ভাবছি, ধর্মঘট করব।' দানাইয়ার মুখ থেকে ঠিক এই ধরনের কথা বেরিয়ে আসবে বুঝতে পারিনি। মনে মনে কয়েকবার যেন আবৃত্তি করতে লাগলাম, দানাইয়া, ধর্মঘট। 'তোমরা করবে?' আমার এই প্রশ্নের মধ্যে যেন কিছুটা বিস্ময় ছিল। অবিশ্বাসের সুর যে ধ্বনিত হয়নি তা নয়। হয়ত ওদের ক্ষমতার প্রতি কিছুটা অবহেলার ভাবও ছিল আমার কথার হাবভাবে।

'হ্যাঁ, আমরাই করব, রাজুবাবু।' তারপর দানাইয়া, কেন করবে, কাদের সে সঙ্গে পাবে, কারা কারা বিরোধিতা করবে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করল।

(২)

দানাইয়া ঘরামি। ঘর তৈরির কাজ যখন বৃষ্টিবাদলার দিনে হয় না তখন সে মুটেগিরি করে। কত লোকের বোঝা সে মাথায় করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। তার মত অন্য যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে হেসে খেলে সে কথা বলে।

ওয়াগানে যখন মাল আসে তখন তার কাজের চাপ পড়ে। এক টন মাল নামাতে পারলে ছ টাকা পাওয়া যায়। কখনও কাজটা দল বেঁধে করতে হয়। কারণ ভারী মাল নামানোর কায়দাকানুন আছে। ঠিক ঠিক ভাবে ঐ কায়দা-কানুন প্রয়োগ না করলে যে কোন সময়ে মাল নিচে পড়ে গিয়ে নষ্ট হতে পারে। আবার কখনও মাল পড়ে যাওয়ার ফলে কুলিদের আঘাত পেতে হয়। অনেক সময় মরেও যায় কোন কুলি। বহু বছর ধরে এক একজন কুলিগিরি করে যাচ্ছে।

অনেকদিন কুলিগিরি করে ওদের মনে হল কর্তৃপক্ষ ওজনে গোলমাল করছে। যত মাল ওরা নামায় তারচেয়ে কম মাল নামানোর অজুহাতে ওদের ঠকানো হচ্ছে। ওরা ঠিক করল চোখের সামনে ওজন করিয়ে দেখবে। কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করল, ওদের সামনে মাল ওজন করতে। রেলকর্তৃপক্ষ ওদের অনুরোধে কান দিল না।

তখন কুলিদের গালে হাত পড়ল, কি করা যায়। অনুরোধে তো হচ্ছে না। সোজা আঙুলে তো ঘি উঠছে না। ওয়াগান থেকে মাল নামানোর ব্যাপারে মাঝে যারা থাকে তাদের হাতে কিছু দিতে হয়। ওরা এক অদ্ভুত সম্প্রদায়। ওরা রেলকে ঠকায় একভাবে, আর কর্তৃপক্ষকে ঠকায় অন্যভাবে। এইসব কথা জানিয়ে দানাইয়া বলল, 'দেখুন রাজুবাবু, আমরা অনেক সহ্য করেছি। হিসেব করে দেখেছি প্রত্যেক বছরে কম করে এক হাজার টাকা ঠকে যাচ্ছি। আমরা মাল তুলি, এখানকার মাল সেখানে পাঠাই, তাই মাল চলাচল করে। আমরা মালে হাত না দিলে যেখানকার মাল সেখানেই থাকবে। দেখবেন, দু দিনে ওদের জিব বেরিয়ে যাবে। বাপ বাপ বলে আমাদের কথামতো

কাজ করতে রাজী হবে। তাই বলছিলাম আপনাকে আমাদের সামনে দাঁড়াতে হবে।'

মনে মনে ভাবলাম, দানাইয়ারা যখন ঠগ বাছাই করতে পেরেছে তখন আর পেছিয়ে থাকা যায় না। ঠিক করলাম, যাব। ধর্মঘটের দিন ভোরে দানাইয়ার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

(৩)

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছি। বার বার মনে প্রশ্ন জাগতে লাগল, এই কি সেই দানাইয়া?

অস্ত্রের সে এক যুগ। একদল বলছে, 'বুলেটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা হবে।' অন্যদল চাইছে বুর্জোয়াদের দলের মধ্যে যারা ভালো আছে তাদের এনে, দল ভারি করে, ক্ষমতা দখল করতে। সেটা ছিল জানুয়ারী মাস। শরীরে উৎসাহ উদ্দীপনা উত্তাপ পাশাপাশি আছে। নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠে শ্লোগানের ধ্বনি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে খাতার সঙ্গে মাথা মেলানোর পালা।

দানাইয়ার পাড়ায় গরিবদের সংখ্যা বেশি। বেশি বললে কমিয়ে বলা হবে। সবচেয়ে বেশি। দরিদ্র নারায়ণ ঐ পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যেতে চায় না। সেই পাড়ায় নির্বাচন নানা কারণে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উত্তাপ আনে। অন্যরা বলে, ঐ পাড়ায় গুণ্ডাদের বাস। আবার কেউ বলে ভবঘুরেদের বাস। ঐ পাড়ার ছেলেদের হাতে নাকি সাইকেলের চেয়ে লোহার রড, শঙ্কর মাছের লেজ আরও কতরকমের জিনিস থাকে। যেখানে যা ঘটুক, বিশেষ করে মারামারি, লোকের ধারণা যে ঐ পাড়ার ছেলে ছিল।

ওদের পাড়ায় প্রচার করতে করতে দানাইয়ার বাড়ির সামনে এসে-ছিলাম। দানাইয়ার চেহারা দেখলে বোঝা যায় এক সময় তার শরীরে বেশ তাগদ ছিল। কাঁধ আর হাতের পাঞ্জা দেখে এখনও অনুমান করা যায় দানাইয়ার শরীর কেমন ছিল। মুখে অনেক খাঁজ পড়েছে। অনেক ঝড়ঝাপ্টা বয়ে যাবার চিহ্ন মুখের রেখায়। অদ্ভুত এক কাঠিন্য তার মুখে।

পাড়ার ছেলেবুড়ো সবাই দানাইয়াকে মানে। কেউ ভয়ে, কেউ ভক্তিতে। দানাইয়াকে একবার হাত করতে পারলে ঐ পাড়ায় আর কাউকে নাক গলাতে হবে না। বার বার গেছি তার কাছে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের নেতা রমণা রেড্ডি। সেদিন ওরা আগুন জ্বেলে নিজেদের গরম করে নিচ্ছিল। দানাইয়াও আগুনের কাছে বসেছিল। আমরা তাকে আমাদের পার্টির কথা ভালভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ আমাদের কথা শুনে আমাদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'কি হবে মশাই, আপনাদের ভোট দিয়ে? এখন, যাহোক একবেলা খেতে পাচ্ছি, আপনারা গদিতে বসলে তাও পাবো না। যাও বা আধপেটা খেয়ে বেঁচে আছি, তাও হারাবো। কংগ্রেস ভুল যে করে না তা নয়, তবু আমরা ওদের সমালোচনা করতে পারি। পাঁচ বছরে অন্তত একবার ওরা আমাদের সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ায়। আমরা যা বলি শোনে। অনেক সময় মাথা নিচু করে শোনে। ভুল স্বীকার করে। এখনও আমরা সমালোচনা করতে পারি। কিন্তু আপনারা গদিতে বসলে আমাদের কথা বলার অধিকার থাকবে না। এখনও আমরা মন্দিরে গিয়ে সুখ দুঃখের কথা ঠাকুরকে জানাতে পারি। আপনারা গদিতে বসলে তো মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এই ধরনের আরও অনেক কথা দানাইয়া বলে যেতে লাগল। এসব কথা আমরা আগেও শুনেছি, অনেকের মুখে। সেদিনও আমরা মাথা নিচু করে শুনেছিলাম দানাইয়ার কথা। বলার ঢংয়ে মনে হল ও কোনদিন আমাদের দলে ভিড়বে না। আমাদের মনে আর একটা আশঙ্কা জেগেছিল, ওর কথা শুনলে হয়ত আমাদের দলেরই দু একজন বিগড়ে যেতে পারে। ক্রমশ দেখা গেল আমাদের দলের কাউকে দেখতে পেলেই সে ডেকে ডেকে আমাদের দলের বিরুদ্ধে দুচার কথা শুনিয়ে দিত।

(৪)

সেই দানাইয়ার কথা মতো কুলিদের ধর্মঘট শুরু হল। আশপাশের শ্রমিকরা দানাইয়াদের প্রতি সমর্থন জানাতে লাগল। আমাদের মনেও,

ওদের উৎসাহ দেখে, ওদের প্রতি বিশ্বাস জেগেছিল। জয় সম্পর্কে কুলিদের মনে কোন সন্দেহ নেই। ওদের মনে সন্দেহ না থাকলেও আমাদের মনে সন্দেহ জাগে। কারণ আমরা তার আগে অনেক আন্দোলন দেখেছি। শ্রমিকদের মনে সাহস জোগাতে অনেক সময় আমরা অনেক কথা বলেছি। আমাদের কথা শুনে শ্রমিকরা কখনও বিশ্বাস করেছে, কখনও বিশ্বাস করেনি। তাছাড়া আর একটা দিক আছে, ধর্মঘট করলেই যাদের ক্ষতি হয় তারা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। এইসব প্রশ্নগুলো আমাদের মনে যখন জাগছিল তখন একটি খবর এল—পুলিশ, মিলিটারী আসছে।

অনেকগুলো লরি এল। লরি থেকে লোহার টুপি পরা খাঁকি পোশাকের পুলিশ গাড়ি থেকে নামল। যেদিকে তাকাই হয় খাঁকি অথবা সাদা পোশাকের বন্দুকধারী। এক কথায় বলতে গেলে গুডস্ সেডটা মিলিটারী ক্যাম্পে পরিণত হল। কুলিদের সংখ্যা মোট তিরিশ। যাদের বিরুদ্ধে ওদের লড়াই তাদের অনেকেই লক্ষপতি, কোটিপোতিও আছে দুচারজন। ওদের দেখাশোনার জন্য রয়েছে অসংখ্য পুলিশ। ন্যাৎসী বাহিনীর কনসেনট্রেশন্ ক্যাম্প কেমন ছিল জানি না। তবে এই বাহিনীকে দেখে কিছুটা অনুমান করা যায়। ছোট্ট যে প্রশ্ন জেগেছিল আমাদের নেতাদের মনে তা দেখতে দেখতে বিরাট আকার ধারণ করল। প্রশ্ন চিহ্ন বিরাট আকার নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

ঐ পুলিশ আর মিলিটারী বাহিনী দেখে কুলিদের মনে ক্ষোভ রাগ প্রভৃতি দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ওরা শ্লোগান দিতে লাগল।

ইতিমধ্যে সার্কেল জোন্ সাব ইনস্পেক্টার বাক্কাইয়া জিপ থেকে নামল। লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে জোন্। পুলিশের চাকরি করতে করতে কেউ কেউ রাক্ষুসে মনোভাবের পরিচয় দেয়। সেদিক থেকে জোন্ অন্য ধরনের।

তারপর এল ডেপুটি এস্. পি. কাসিম খান্। তার চোখ মুখ

দেখে মনে হল একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে তাকে গভীরভাবে ভাবতে হচ্ছে। কুলিদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আধ ঘণ্টার মধ্যে মিটিয়ে ফেল। কাজ শুরু করে দাও। ধর্মঘট চলতে থাকলে আলোচনার অসুবিধা হয়। শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি না হলে কোন আলোচনাই শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। আধঘণ্টার মধ্যে সবাই কাজে যোগদান কর।' বলে কুলিদের দিকে ঘুরে ঘুরে সে তাকাতে লাগল।

'আমরা তো কাজ করতেই চাই। বহু বছর ধরে করছি। যতদিন বাঁচব, করব। আপনারা আমাদের মালিকদের বুঝিয়ে বলুন। আমাদের দাবী অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। আপনারা মালিকদের সঙ্গে বসে, ওদের বুঝিয়ে, আমাদের জানিয়ে দিন।' আমরা বললাম, 'পুলিশের কাজ রেলের সম্পত্তি রক্ষা করা। এখান থেকে সরে আমরা কোথাও যেতে পারি না।'

'তোমরা কাজ শুরু না করলে অন্য কুলিরা এসে ওয়াগান থেকে মাল নামাবে। এখন যেমন সম্পত্তি রক্ষার জন্য পাহারা দিচ্ছি তখনও আমরা একই উদ্দেশ্যে পাহারা দেব। তবে অশান্তি যদি দেখা দেয় পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।' এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে কাসিম্ খান্ বলল।

'অন্য জায়গা থেকে কুলিরা এসে আমাদের পেটে যদি লাথি মারতে চায়, আমরা কি লাথি খাব? সেটা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? হঠাৎ আপনাদের চাকরি, আপনাদের মুখের ভাত কেড়ে নিলে আপনারা কিছুই করবেন না?' আমরা বললাম।

আমাদের মধ্য থেকে একজন কুলি বলল, 'একদিন তোমরাও ঘুঁটে হবে।'

কথাটা কানে যেতেই কাসিম খান্ বলল, 'এটা তর্ক করার জায়গা নয়। কোনরকম অশান্তি যেন দেখা না দেয়। সাবধান!' বলে কাসিম খান্ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। অন্য শেড থেকে কুলিদের আনিয়ে এই শেডের কাজ করানোর চেষ্টা চলছে। উদ্যোগ নিয়েছে

ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রমণা রেড্ডি। স্বাধীনতার পর সে নানা-ভাবে চেষ্টা করে বড়লোক হয়েছে। এখন তাকে যে কোন ব্যাংক দারুণ বিশ্বাস করে। শুধু ব্যবসায়ীরাই তাকে মাথায় তুলে নাচে তা নয়, জোড়া জীবের কাঁধে ভর করে, ওদের দেহের চিহ্ন সামনে রেখে রমণা রেড্ডি এম. এল. এ. হয়েছে। সেখানেই তার উন্নতির শেষ নয়, মন্ত্রীর পদও তার কপালে জুটেছে। ১৯৫৫ সালে এই বৃক্ষের ছায়াতেই দানাইয়া কিছুদিন কাটিয়েছিল। যেকোন পুলিশ বদলি হয়ে শ্রী রেড্ডির এলাকায় এলে তাকে প্রথমে রেড্ডি মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে, নমস্কার জানিয়ে তারপর থানায় আসতে হয়। এটা অলিখিত নিয়ম কিন্তু অবশ্য পালনীয় ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল লোক ঐ শেডের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। দানাইয়া ওদের চেনে। ওদের সঙ্গে একসঙ্গে মন্দিরে পূজো করে। শীতকালে বাইরে আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসে আগুনের তাপে গরম হয়। দানাইয়ার কাছে ওরা গল্প শোনে। তাকে দেখলে জ্বলন্ত বিড়ি মুখ থেকে নামিয়ে লুকিয়ে ফেলে অথবা ফেলে দেয়। সেইসব লোককে শেডের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে দানাইয়ার শরীরের রক্তে যেন আগুনের দাবানল ছড়িয়ে পড়ল।

দানাইয়া ওদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কোত্থেকে একটা ভোজালি টেনে নিয়ে তুলে ধরে চিৎকার করে উঠল, 'রেই!' পাগলের মত সে চিৎকার করে উঠল। মুহূর্তেই যেন বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। প্রত্যেকেই দানাইয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। সে কখনও কারও মুখের দিকে তাকিয়ে বেশি কথা বলতে পারত না। হঠাৎ সে ভাষণ দিতে শুরু করে দিল, 'মনে রেখ, আমরা সবাই এক। আমাদের মারার জন্য তোমাদের আনা হয়েছে। তোমাদের আঙুল আমাদের চোখে ঢুকিয়ে দিতে চাইছে ওরা। তোমরা ওদের কথা শুনবে না। এস, আমরা এখানে একসঙ্গে দাঁড়াই।' এই ভাবে সে বেশ কিছুক্ষণ বলে গেল। তার বক্তব্যে কখনও নির্দেশ ছিল,

আবার কখনও ছিল অনুরোধ। ওদের হাবভাব দেখে দানাইয়ার রাগ আরও বেড়ে গেল। রাগ মনের ভিতরে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল। শিরায় শিরায় রাগের প্রবাহ। ভোজালিটা আরও শক্ত করে ধরল সে। তারপর ওদের এক একজনের নাম ধরে ধরে ডাকল। ওদের নাম ধরে ধরে গালাগাল দিতে লাগল। তারপর আবার ভাষণ শুরু করল, 'কি চাইছ তোমরা? তোমাদের পাড়ার লোক, তোমাদেরই মত যারা গরিব, তাদের পেটে লাথি মারতে চাইছ? কি শিখলে এতদিনে তোমরা? গরিবের ছেলে হয়ে গরিবের পেটে লাথি মারবে? জবাব দিচ্ছ না কেন? মুখে কি খড় পুরে রেখেছ?' দানাইয়ার প্রশ্ন ওদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। ওরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু কারও মুখে কোন কথা নেই। ওদের পেটে গোঁজা রিভলবার গুলো হাতের মুঠোতে এল। কোমরে বাঁধা শঙ্কর মাছের চাবুক বাতাসে সাঁ সাঁ আওয়াজ তুলতে লাগল। পকেটে রাখা সাইকেলের চেন হাতে হাতে ঝুলে পড়ল।

কিসের জন্য এসব? কি করতে যাচ্ছে ওরা? মালিকদের বিরুদ্ধে লড়বে নাকি? পুলিশের বিরুদ্ধে কি ওদের সংগ্রাম? তাহলে পুলিশ অমন করে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

একজনের হাতের রিভলবার গর্জে উঠল। পরমুহূর্তে দানাইয়ার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কুলিরা হতবাক। পরমুহূর্তেই সোডার বোতল ওদের ওপরে পড়তে লাগল। দানাইয়া শেষবারের মত কি যেন বলতে লাগল। তৎক্ষণাৎ জোনের ঘুঁষি দানাইয়ার মুখে লাগল। দানাইয়ার মুখ থেকে গলগল করে রক্ত বের হতে লাগল। পরক্ষণেই পুলিশের ঘোষণা শোনা গেল, 'এখানে একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়েছে। পাঁচজনের বেশি কোথাও থাকলে এ্যারেস্ট করা হবে।' ঘোষণাটা ভ্যান থেকে আসছিল।

আগে থেকেই আমরা অনুমান করেছিলাম এই ধরনের একটা কিছু হবে। যে লোকটা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত সে গুলিবিদ্ধ দানাইয়াকে ঘুঁষি

মারল। ওরা অত্যাচারের দিক থেকে সাদা চামড়ার সাহেবদের চেয়ে যে কোন অংশে কম নয় তার প্রমাণ দিল।

কুলিরাও দুচোখ ভরে দেখল এই দৃশ্য। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন করে আমরা ভাগ হয়ে গেলাম। প্রত্যেক দলে পাঁচজন করে আছে। একটা দল থেকে আর একটা দলের দূরত্ব কম করে পাঁচ গজ। দানাইয়ার রক্তে মাটি ভিজে গেলেও একটি কুলিও পিছু হটল না। দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক এরকমটা যে ঘটবে, আমরা যে এভাবে বিভক্ত হব, তা হয়ত কাসিম খান্ ভাবতে পারেনি। সে চিৎকার করে উঠল, 'ডিসবার্স'ড্ !' তারপর আরও জোরে বলল, 'ওয়ার্ণিং ওয়ান।' তারপর আমাদের মুখোমুখি এসে রিভলবার ধরে সে বলল, 'কি হল শুনতে পাচ্ছ না ? এখান থেকে সরে যাচ্ছ না কেন ?'

'পাঁচজণের বেশি কোন দলে নেই। সরার কোন প্রশ্ন উঠে না।' আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম।

'সাট্ আপ ! গো !' পাগলের মত চিৎকার করে উঠল সে। ভ্যান থেকে ঘোষিত হল, 'ওয়ার্ণিং টু।' জোনের গলা মাইকের ভেতর থেকে ভেসে এল। বিরাট লাঠিধারী পুলিশ বাহিনী সারিবদ্ধভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। কিছু পুলিশের হাতে টিয়ার গ্যাস। এ দৃশ্যও কুলিরা বড় বড় চোখে দেখল।

'চার্জ !' কাসিম খাঁর গলা একশটা কাঁসর ঘণ্টা বাজার মত বাজল।

একসঙ্গে পুলিশের লাঠি ওপরে উঠল। কুলিদের গায়ে পড়ল। তাদের জামা ছিঁড়ে গেল। তাদের কারও কারও শরীর থেকে রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে বেরুল। পুলিশ দ্রুত এগিয়ে প্রথম সারির লোককে টপ্‌কে দ্বিতীয় সারির লোককে মেরে তৃতীয়দের মারার আগেই প্রথম দল পুলিশের পেছনে গিয়ে পেছনের দিকে তোলা লাঠিগুলো একটানে কেড়ে নিল। একসঙ্গে কুলিদের সে কি উল্লাস ! পুলিশরা হতবাক। কিন্তু এসব কয়েক মুহূর্তের জন্যই। পরমুহূর্তেই টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় ঐ অঞ্চল ভরে গেল। কুলিরা পকেট থেকে পেঁয়াজ বের করে নাকের কাছে

রাখল। পুলিশদের চোখ জ্বালা করল। সেই ধোঁয়া লাগার ফলে অদূরে দাঁড়ানো রমণা রেড্ডির চোখেও জল এল। তারপর বন্দুকধারী লোহার টুপি পরা মিলিটারী এগিয়ে এল। 'ডিস্‌বার্স্‌ড্! ওয়ান…টু …থ্রি।' সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের ধ্বনি শোনা গেল। এই ভয় পাওয়ানো শব্দ হওয়ার আগেই আমরা রিট্রিট্ করেছি। সেখান থেকে সরে পড়েছি। আমাদের শ্রমিকরা জীবন দিয়ে বুঝল পুলিশ মিলিটারী তাদের উপর যেকোন সময় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

বিজয়গর্বে কাসিম খান্ সিগার ধরাল! ইনস্‌পেক্টার জোন্ সাব ইন্‌স্‌পেক্টার বাঙ্কাইয়া কাসিম খানের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের দিকে সিগারেট এগিয়ে দেওয়াই রমণা রেড্ডির কাজ ছিল। পুলিশ ভ্যান ফিরে গেল। লরি করে যে পুলিশ মিলিটারী এসেছিল তারাও যে যার আস্তানায় ফিরে গেল।

(৫)

সেই রাত্রে বাসোটা হোটেলে হাজার হাজার টাকা খরচ হল। সিগারেট মাংস আর মদের ফোয়ারা ছুটল। রমণা রেড্ডির বেশ কিছু টাকা সেই রাত্রে খরচ হয়ে গেল। পরের দিন ভোরে কিছু ভিখিরির ছেলে হোটেলের পেছন দিকে পড়ে থাকা এঁটো মাংসের টুকরো আর হাড় কুকুরের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেতে লাগল। কাসিম খান্ ব্যাঙ ধরা সাপের মত বুঁদ হয়ে বসেছিল আরাম কেদারায়।

(৬)

পুলিশের পাহারায় পরের দিন ওয়াগান থেকে মাল নামানো হল। তারপর সেই মাল লরিতে করে নিয়ে যাওয়ার পালা।

'রাঘব, শ্রমিকদের ভাত মেরো না। ওদের পেটে লাথি মেরে তুমি সুখী হতে পারবে না।' লরি ওয়ার্কার্স' ইউনিয়নের সভাপতি চিৎকার করে বলল। রাঘব মুঠো করা হাত ওপরের দিকে তুলে রাজী হল। পরক্ষণেই কাসিম খান্ রাঘবের ঐ তোলা হাত ধরে ফেলল। লরিতে দাঁড়িয়ে থাকা কুলিরা ঝট্‌পট্ নেমে কাসিম খানকে ঘিরে দাঁড়াল।

তারপর এগিয়ে এল লাঠিধারী পুলিশ। দানাইয়ার শেষ রক্তবিন্দু আমার চোখের সামনে ঝরেছিল। অনেকদিন পরে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, আত্মরক্ষার জন্য পুলিশের গুলিচালনা। সংঘর্ষে একজন পুলিশের মৃত্যু।'

এখন যে হাওয়া বইছে

সি এস. রাও

দুই প্রহর বেলা হল। রামালয়ের সামনের বটতলায় গাঁয়ের মাতব্বররা বসেছিল। একজনের গোঁফ বড় বড়। অন্যজনের মাথায় ছিল পাগড়ি। আর একজনের চশমা নাকের উপর গড়িয়ে পড়ছিল। চশমা পরা করণম্, নাকের ডগায় চশমা রেখে, যাতায়াতকারীদের উপর নজর রেখেছিল। কখনও মাথা উপরের দিকে তুলে কখনও নিচের দিকে নামিয়ে খুঁজছিল ছড়িধারী মুনসেফকে।

ছড়িধারী মুনসেফ এল।

'কি ব্যাপার? পাশের ঘরগুলোতে আগুন লেগেছে আর তোমার ঘুম ভাঙছে না?' করণম্ বলল মুনসেফকে।

'সেই কালকে আগুন লেগেছিল। এখনও নিভে যায়নি?'

'নিভে আর কোথায় গেল। আরও বেশি করে জ্বলছে। আগুন ছড়াতে ছড়াতে গোটা দেশ জ্বলে উঠবে কিনা কে জানে। এখনও প্রেসিডেন্টের পাত্তা নেই।'

'খবর পাঠিয়েছি। এসে যাবে।' বলতে বলতে করণমের পাশে বসে চুট্টা ধরাল মুনসেফ। করণম্ নস্যি নিল। পাগড়ি বাঁধা লোকটা পাগড়ির ভাঁজের ভেতর থেকে চুট্টা বের করে একপ্রান্ত দাঁত দিয়ে কেটে থুপ্ করে থুথু ফেলে মুনসেফকে বলল, 'আগুন দেখি মামা।'

‘করণম্ মশাইয়ের কাছে চেয়ে নাও।’

‘আমার কাছে আগুন থাকবে কেন? আমি তো নস্যি টানা লোক। ওসব থাকবে কেন?’ করণম্ বলল।

‘তুমি চাইলে, তোমার কাছে আগুনের আসতে কি আর দেরি হবে?’ মুনসেফ খোঁচা মেরে যেন বলল।

‘থাক্, থাক্। এসব কথা আমাদের মধ্যে হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু কেউ শুনতে পেলে, সত্যি ভাববে।’

‘এসব কে না জানে বাওয়া।’ হাসতে হাসতে মুনসেফ বলল।

এমন সময় প্রেসিডেন্ট প্রকাশমকে দেখে, আশপাশের সকলের উদ্দেশ্যে করণম্ বলল, ‘ঐতো, মহান নেতা এদিকেই আসছেন। সোজা-সুজি কথা বলে আজকেই একটা ফয়সালা করতে হবে কি না?’

‘যা বলার তুমিই বল। আমরা কি কোনদিন তোমার কথার পিঠে কথা বলেছি?’ মুনসেফ বলল।

শুঁফো সুব্বান্না গোঁফে পাক দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। প্রকাশম্ কাছে এলে তাকে আহ্বান জানাতে জানাতে করণম্ বলল, ‘এস প্রকাশম্, এখানে বসো।’

‘গাঁয়ের মাথা সবাই এখানে জড়ো হয়েছেন। কি ব্যাপার?’ বলতে বলতে করণমের পাশেই বসল প্রকাশম্।

‘তুমি কি জান না কেন জড়ো হয়েছি?’ বলল শুঁফো সুব্বান্না।

‘সে যাক্‌গে, আসলে ব্যাপারটা কি বলত প্রকাশম্?’ বলতে বলতে করণম্ এমন ভাব করল যেন সে সবকিছু তার কাছে জানতে চায়।

‘ব্যাপার আবার কি! কালকে তো সারাদিন বৃষ্টি পড়েছে। পথ ঘাট কাদা কাদা হয়ে গিয়েছিল। পাশের গাঁ থেকে একটা ছোকরা এসে মন্দিরের পাশে টিউবকলে পা ধুচ্ছিল। তাকে দেখে সুব্বান্না প্রশ্ন করেছিল, “কে হে তুমি?” জবাবে ছেলেটি বলল, “আমি আপ্পলুর ভাগনে।”

‘আপ্পলু মানে কে? আমাদের ঐ ডোমপাড়ার আপ্পলু কি?’

করণম্ জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ সেই।' সুব্বান্না তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল।

"'জাতে তুমি ডোম। মন্দিরের কলে পা ধুচ্ছ? তোমার কি পাখা গজিয়েছে নাকি?" সুব্বান্না নাকি এই কথাটা জোরে জোরে বলেছিল। এখন ছেলেটা তো মফঃস্বলের ছেলে, সেও বলেছিল, 'আমরা তো মন্দিরের ভেতরে ঢুকে থাকি। কলে পা ধুয়েছি, তাতে কি হয়েছে?' এই কথা শুনে সুব্বান্নার রাগ হল। তারপর কথার পিঠে কথা বেড়ে গেল। পরে নাকি সে ছেলেটাকে দু চার ঘা মেরেছে।'

প্রেসিডেন্ট প্রকাশম্ এইভাবে ঘটনাকে বর্ণনা করায় সুব্বান্না বিরক্ত হয়ে, রেগে গিয়ে বলল, 'ঘটনাটা তো সেখানেই শেষ হয়ে যায়নি। তাহলে তো আর কথাই ছিল না। তারপর কি হল জিজ্ঞেস করুন।'

'তারপর ডোমপাড়ার মাতব্বররা—বীর পুত্রাইয়া, ডোমপল্লী কমিটির সদস্য সোমাইয়া, দাবীজ ঐ ছেলেটাকে আর আপ্পলুকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে বিচার চাইল। আমি তখন সুব্বান্নাকে ডেকে পাঠালাম। ওর মুখেও সব শুনলাম। দেশে অনেক মন্দিরে হরিজন-দের প্রবেশ অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে। মন্দিরের সামনের কলে হরিজনের পা ধোয়া অপরাধ হয়নি বলে, তার জন্য মারা অপরাধ হয়েছে বলে আমি বলেছিলাম। আর কোনদিন এই ধরনের কাজ না করতেও বলেছিলাম। ভবিষ্যতে কারও গায়ে ওভাবে হাত তুললে জরিমানা দিতে হবে বলেও সুব্বান্নাকে বলেছিলাম। তারপর ওদের বুঝিয়ে শুনিয়ে চলে যেতে বলেছি।' বলল প্রকাশম্।

'তারপর ওরা বোধহয় খুশীই হয়েছে?' বলতে বলতে মুনসেফ নিভে যাওয়া চুট্টা ধরিয়ে নিল।

'তাহলে তো কথাই ছিল না। ওরা সবাই মন্দিরে ঢুকতে চায়। ওদের ইচ্ছা আমি ওদের সঙ্গে থাকি। মানে আমাকে নিয়েই ওরা মন্দিরে ঢুকতে চায়।' বলল প্রকাশম্।

'রাজী হয়েছ নিশ্চয়?' করণম্ যেন ব্যঙ্গ করে বলল।

'না। আমি বলেছি, "চারজনের সঙ্গে আলাপ করি। তোমরা কয়েকদিন অপেক্ষা কর। অত ব্যস্ত হলে কি চলে। তবে তোমাদের দাবী ন্যায্য।" এই ধরনের কথা বলে আমি ওদের বিদায় দিয়েছি।'

'যাই হোক, আগামী বারেও প্রেসিডেন্ট হওয়ার বোনাদ তৈরি হয়ে গেল। না, তোমাকে সাধারণ লোক ভেবেছিলাম, কিন্তু তা নয়, ঘটে বেশ বুদ্ধি রাখ।' করণম্ হাসতে হাসতে বলল।

প্রকাশমের ভীষণ রাগ হল। সে বলল, 'করণম্ মশাই এই পদের জন্যে আমি প্রার্থী হয়ে দাঁড়াইনি, কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিনি। আপনারাই আমাকে ধরে বুঝিয়ে প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। এই ঘটনাটা ভুলে যাবেন না।' বলেই ঝট্ করে উঠে প্রকাশম্ চলে যাবে, এমন সময়, 'প্রকাশম্, অত রাগের কি আছে? আর যাই হোক, করণম্ তো পর নয়, আমাদেরই লোক।' বলতে বলতে মুনসেফ প্রকাশমকে ধরে এনে বসাল। করণম্ মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে চাপা হাসি হাসল। টেনে একবার নস্যি নিল সে।

'প্রকাশম্, আমার উপর অত রাগ কিসের? দশ হাজার লোকের মধ্যে আমিই প্রথম তোমাকে প্রেসিডেন্ট করতে চেয়েছিলাম।' বলে করণম্ সুব্বান্নার দিকে তাকাল। সুব্বান্না মুখ ঘুরিয়ে থুপ্ করে থুথু ফেলল।

করণম্ আবার হাসিমুখে বলল, 'প্রকাশম্, তুমি কি জান, কেন আমরা তোমাকে প্রেসিডেন্ট করেছি? আমাদের গ্রামের লোক কথায় কথায় যাতে পথে নেমে ঝগড়া না করে, কোর্ট কাছারিতে যখন তখন ছোটাছুটি না করে, সেইজন্যই তো? বয়সে তুমি ছোট হলেও লেখাপড়া জানা লোক, বুদ্ধিমান, কথাবার্তা বলতে পার, আমাদের আচার বিচার ঐতিহ্য সবকিছু বুঝে শুনে তুমি ঠিকভাবে রক্ষা করবে। এই আশাতেই তো তোমাকে প্রেসিডেন্ট করা, না কি?'

'তা হয়তো হবে।' প্রকাশম্ বলল।

'তাই যদি হয়, তাহলে তুমি যদি ঐ ডোমদের সামনে সুব্বান্নাকে

ডেকে পাঠিয়ে, তাকে ধমক দাও, তাহলে ওর মনে কি ক্ষোভ জমবে না? তুমি জান, ওর ঠাকুরদা, ছোটখাটো অপরাধ করলেও ডোমদের মাঝরাস্তায় দাঁড় করিয়ে চাবকাতো। সুব্বান্নার বাবাও সেইরকম তেজী পুরুষ ছিলেন। তখনকার দিনে কেউ ভয়ে মুখ খুলতে পারত না। অত ঝুটঝামেলাও ছিল না। আর সুব্বান্না, যতই হোক, ঐ তো তোমার আগে প্রেসিডেন্ট ছিল। তার আমলেও মোটামুটি একই অবস্থা ছিল। এ হেন লোককে তুমি যদি ডোমদের সামনে অপদস্থ কর সে বেচারা কি মনে ব্যথা পাবে না? এছাড়া, তুমি কোন্ সাহসে ওদের মন্দিরে ঢোকার দাবীকে ন্যায্য বললে? এতে কি আমাদের গাঁয়ের ঐক্য নষ্ট হবে না? আচার বিচার ধ্বংস হবে না? কই, ওদের ঐক্য তো ঠিক আছে। ওরা কি ওদের আচার বিচার ত্যাগ করেছে? অত কেন, ঐ ডোমদের মন্দিরে ঢোকার পর, জিজ্ঞেস করে দেখ না, তোমার নিজের মা কি মন্দিরে ঢুকতে রাজী হবেন?'

'সে যাই হোক, আগে যা হয়েছে হয়েছে। এখন দিন বদলাচ্ছে। এই দিন বদলের পালায় আমরা কি না বদলে থাকতে পারি?'

'ভাল কথা বলেছ হে। যেদিকে হাওয়া সেদিকে ঘুরব? তাহলে আর আমাদের নিজেদের একটা ইযে, মানে স্বাতন্ত্র্য কি রইল। আমরা দিনগুলোকে বদলাব! দিনগুলোর কাছে যদি আমরা নত হই তাহলে আমাদের ক্ষমতা কিসে? তোমার বয়স এখনও কম, পাপপুণ্য জ্ঞান নেই, ছোঁয়াছুঁয়ির ধার ধারো না। তুমি যে ওদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি কর সেটা আমি জানি। ব্যক্তিগত ভাবে যে যা ইচ্ছা করে যাও ক্ষতি নেই কিন্তু যেটাতে সবাই জড়িয়ে যাচ্ছে এমন বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। তার ফল কি হবে তা ভালভাবে ভেবে দেখা উচিত নয় কি প্রকাশম্?' করণম্ টিপে টিপে কথাগুলো বলল।

'ওদের কথা কি ন্যায্য নয় বলতে চান? মন্দিরের সামনের কলে পা ধুলে কিসের ক্ষতি হয়? জল আছে কিসের জন্যে? শুদ্ধ করার জন্য। জল শুদ্ধ করে, জল নিজে অশুদ্ধ হয় না।'

'এখন কথার পিঠে কথা ওঠে। আমরাও তো বলতে পারি, ডোম-পাড়ায় ওদের তো মন্দির আছে। ওদের মন্দিরে ওরা ঢুকছে ঢুকুক। আমাদের মন্দিরে ঢোকার জন্য ওদের অত হাঁকপাকানি কেন?'...আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল করণম্‌ এমন সময় ডোমপাড়ার মাতব্বর, ডোম-পল্লীর সদস্য এবং আরও কয়েকজন ডোম সেখানে হাজির হল। করণম্‌ ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিরে, সবাই একেবারে জোট পাকিয়ে চলে এলি? কিরে পুত্রাইয়া, এক্ষুণি তোরা মন্দিরে ঢুকতে চাস নাকি?'

'আজ্ঞে, গাঁয়ের চারজন মাতব্বরকে জিজ্ঞেস করে, কথা বলে, জানাব বলেছেন প্রেসিডেন্ট।' বলল পুত্রাইয়া।

'ওরে শোন, শোন, আমার একটা কথা শোন। আমরা এতদিন মা এবং সন্তানের মত একই গ্রামে আছি। আমাদের আচার বিচার আমরা মেনে চলি, তোদের আচার বিচার তোরা মেনে চলিস। তোদের আলাদা মন্দির আছে। হঠাৎ একদিন আমাদের মন্দিরে ঢুকেই বা তোদের কি লাভ হবে বল? বল, এর কারণ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বলেই তোদের জিজ্ঞেস করছি।' করণম্‌ বলল।

'তা ঠিক বলেছেন। তবে কথা কি জানেন সব জায়গায় আমাদের জাতের লোক তো মন্দিরে ঢুকছে, এখানে মন্দিরের সামনে পা ধুতে গিয়ে যখন বাধা পেল তখন সবাই বসে ঠিক করল যে মন্দিরে ঢুকবে।'

'ও, তোরা তাহলে ঠিক করে ফেলেছিস?'

'আজ্ঞে, সে রকমই তো সবাই বলছে।'

'বেশ, তোদের ঢোকার আনন্দ যখন এতখানি চাগা দিয়েছে তখন আমি আর বারণ করি কেন। ভাল একটা দিনক্ষণ দেখে তোদের ইচ্ছা তোরা পূরণ কর। তবে হাঁকপাঁক করিস না, ঠাকুর দেবতা বলে কথা, তোদের কারও ক্ষতি হলে আমি মনে বড় ব্যথা পাব। আচ্ছা, এখন তোরা আয়। চল হে, যাওয়া যাক। আমাদের গ্রামই বা পেছনে থাকে কেন, দিন যখন বদলাচ্ছে, বদলাক। ওঠ, চল।' বলতে বলতে করণম্‌ উঠে দাঁড়াল। তাকে অনুসরণ করল মুনসেফ ও

সুব্বায়া। অন্যেরা যে যার পথে চলে গেল।

প্রকাশম্ এবং ডোমপাড়ার লোক ভাবতে পারেনি যে এত সহজে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তারা মনে মনে খুব খুশী হল।

করণম্ সেখান থেকে উঠে সোজা বাড়ি চলে যায়নি। সে মুনসেফ ও সুব্বায়াকে নিয়ে মুনসেফের বাড়িতে বসল। ব্যাপারটাকে নিয়ে সে আর একবার আলোচনা শুরু করল।

গোঁফ পাকাতে পাকাতে সুব্বায়া বলল, 'মন্দিরে ঢুকব বললেই কি ঢোকা যাবে? অত সহজ? আসুক না, এক এক জনের ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো।'

'সুব্বায়া, এসব ব্যাপারে অত উতলা হলে চলে না। ভাল করে চারদিক ভেবে কাজ করতে হয়। চারদিকের হাওয়া বুঝে কাজ করতে হয়। দিনকাল ভাল নয়, কথায় কথায় যাব তার মাথায় জুতো পড়ছে। ওদের সঙ্গে মুখোমুখি ঝগড়া বিবাদ করা ঠিক হবে কিনা ভেবে দেখতে হবে। আসল গলতিটা হয়েছে কোথায় জান? প্রকাশম্‌টাকে প্রেসিডেন্ট করাই ভুল হয়েছে।' করণম্ আক্ষেপ করে বলল।

'আসলে ও নাম কিনতে চায়। নেতা হতে চায়।' মুনসেফ বলল।

'এসবের মূলে তো সেই লোকটাই! যে নিজে ষোলআনা ব্রাহ্মণ, অথচ ফস্ করে লিখে ফেলল "মালপল্লী" (ডোমপল্লী) উপন্যাস। নায়ক করল একটা ডোমকে। আমাদের জাত ভাইরা সব গালে হাত দিয়ে ভেবেছি। অতই যদি লেখার সখ হয়ে থাকে তো রামায়ণ মহাভারত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখলেই পারত। নিদেন পক্ষে শ্লোকের অনুবাদ বা উপদেশাবলী লিখলেই তো হত। তাতে কোন ক্ষতি ছিল না, বরং একটু নামও হত।' আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল করণম্।

'ওসব কথা থাক। এখন কি করা যায় তাই বল। ওদের কি তাহলে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হবে, না আমাদের করণীয় কিছু আছে?' মুনসেফ জিজ্ঞেস করল।

'অত সহজ নয়, আগে চাকরটাকে পাঠিয়ে মুচিদের ডেকে পাঠাও।'

'ওরা কি করবে ?'

'পরে বলছি, আগে ডেকে পাঠাও তো।'

'ঠিক আছে।' বলে মুনসেফ মুচিদের ডাকতে চাকর পাঠাল।

চাকর মুচিদের পাড়ায় গেল। ডোমপাড়া থেকে এক ফার্লং দূরে ছিল মুচিদের পাড়া। ডোমপাড়ার কুয়োর পাশ দিয়ে যেতে হয় সেখানে। মুচিপাড়ায় একটা মড়া বলদের চামড়া ছাড়াচ্ছিল মুচিদের মাতব্বর আপ্পি।

'মুনসেফ তোমাদের মধ্যে যারা মাথা তাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।' বলল চাকরটা।

'মুনসেফ মশাই একমাস হল জুতো সেলাই করতে বলে গেছেন।' যন্ত্রের অভাবে জুতোটা সেলাই করতে পারলাম না। না জানি কত কথা শোনাবে।' বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল আপ্পি।

'ওটা নয়, অন্য একটা কাজ আছে।' বলে চাকরটা ফিরে গেল।

চাকরের পেছনে পেছনেই মুচিপাড়ার আপ্পি সহ কয়েকজন এসে মুনসেফের বাড়ির সামনে জোড়হাত করে দাঁড়াল।

'তোরা ঐ পেছন দিক দিয়ে খিড়কির দরজায় আয়।' বলে করণম্ নিজেই পথ দেখাতে দেখাতে খিড়কির দরজার কাছে গেল। সেখানে সুব্বাম্মা ও মুনসেফ বসেছিল।

করণম সশব্দে একটিপ নস্যি নিয়ে বলল, 'কিরে আপ্পি, চিরকাল কি তোরা এইভাবেই কাটিয়ে যাবি? নাকি উন্নতি করার ইচ্ছে আছে?'

'উন্নতি কি করে হবে আজ্ঞে? জুতো সেলাই করে আজকালকার দিনে কি করে উন্নতি করব?' আপ্পি বলল।

'আছে, পথ আছে। উন্নতি করার ইচ্ছে থাকলে অনেক পথ আছে। আজকাল যারা জুতো সেলাই করে তারাও সরকারের কাছ থেকে ধার পেতে পারে। কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সবকিছু করা যায়। ধার করা টাকা দিয়ে অনেক যন্ত্রপাতি কেনা যায়। হাজার হাজার জুতো তৈরি করা যায়। তখন তোদের উন্নতি ঠেকায় কে? তবে হ্যাঁ, সবই

করা যায় যদি তোদের ইচ্ছে থাকে। তোদের ইচ্ছেটাই আসল।'

'আজ্ঞে এসব তো আমরা জানি না। এই এখন আপনি বললেন, জানলাম। আমাদের তো বাবু অক্ষর জ্ঞান নেই, কি করে জানব এসব?'

'আমরা কি মরে গেছি? সবাই একটা কাগজে টিপসই দিয়ে দে, দেখি কি করতে পারি।' বলে করণম্ মুনসেফের দিকে তাকাল। মুনসেফ এমনভাবে তারদিকে তাকাল যেন সে বলছে, 'বাবা, করণম্ তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে বটে। একদিকের আগুন দিয়ে অন্যদিকে আগুন লাগাতে চাইছ?'

ঐ চাউনি দেখে করণম্ বুঝল মুনসেফ তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তারপর সে আবার বলল, 'সরকারের কাছ থেকে টাকা আনতে হলে তোমাদের মধ্যে ঐক্য চাই। ছদিন পরে ঐ ডোমগুলো আমাদের মন্দিরে ঢুকবে। তোমরা ওদের সঙ্গে মিলেমিশে ঢুকতে পার। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, তোমরাই বা পেছনে পড়ে থাকবে কেন? ভাল কথা, ওরা তোমাদের সঙ্গে নেবে তো? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে।'

'আজ্ঞে সন্দেহ কি বলছেন। ওদের কুয়োর জল তুলতে যাই, তাতেই বাধা দেয়। গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে অনেক কষ্টে আমাদের এক হাঁড়ি, এক হাঁড়ি করে জল তুলতে হয়।' বলল ওদের মধ্যে একজন।

'এখন আর ওসব বাধা থাকবে না। তোরা যে কোন টিপকল টিপে জল নিতে পারিস। যে কোন কুয়ো থেকে জল তুলতে পারিস। ওসব নিয়ে আর ঝগড়াঝাঁটি হবে না। এক কাজ কর, আজ রাত্রেই তোরা ডোমপাড়ার কুয়ো থেকে জল তোল। তবে প্রথমবারে সবাই মিলে কুয়োর কাছে আয়। ওরা কেউ বাধা দেবে না। ওরা তো আমাদের মন্দিরে ঢুকতে চাইছে। ওরা যদি আমাদের মন্দিরে ঢুকতে পারে তবে তোরা ওদের কুয়োর জল নিতে পারবি না কেন?'

'আজ্ঞে গোলমাল হতে পারে।'

'তোর মুণ্ডু। আমরা আছি কি করতে? এটুকু কাজে যদি তোরা ভয়ে মরে যাস, আজ বাদে কাল, তোরা কো-অপারেটিভ করবি কি করে?

পাড়ায় অফিসার ঢুকবে, তোদের কুঁড়েঘরে বলবে, তখন কি করবি ? শোন, দিন বদলেছে তোদেরও এগোতে হবে। কি বল মুনসেফ ?'

'সত্যি তো, অত ভয়ের কি আছে।' মুনসেফ করণমের কথার সমর্থনে বলল।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই মিলে বলল, 'না, আমরা ভয় পাচ্ছি না।'

ঠিক আছে, আজ রাত্রেই তোরা কুয়োর জল আনতে বেরিয়ে পড়।' বলে করণম্ মুচিদের বিদায় দিল।

'তাহলে কি দাঁড়াল ? ডোমগুলো মন্দিরে ঢোকার আগেই মুচিদের সঙ্গে ওদের একচোট হয়ে যাচ্ছে। তুমি তো মহা চতুর লোক হে।' হাসতে হাসতে মুনসেফ বলল।

'করণম্ মশায়ের মাথা বলে কথা।' সানন্দে বলল সুব্বান্না।

'পায়ের তলায় বাবলা কাঁটা ফুটলে সোনার ছুঁচ দিয়ে সেটা বের করে কেন ? পুরো কাঁটাটাকে তুলে আনার জন্য। ওরা যখন আমাদের মন্দিরে ঢুকতে আসছে আমাদের বাধা দেওয়ার কি দরকার ? আমরা যদি ঐ মুচি ও ডোমদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিতে পারি তাহলে কয়েকটা মাথা ফাটবে। তখন ওরা নিজেরাই ভাববে মন্দিরে ঢোকার কথা ভাবতেই যখন এতবড় বিপদ ঘটল তখন মন্দিরে ঢুকলে না জানি কি বিপদ হবে। তারপর আর কি, লেজ গুটিয়ে যে যার বসে পড়বে।'

'সাবাস্ বাওয়া। কুরুক্ষেত্রে তোমার মত লোক অপরিহার্য।'

'সবই সঙ্গদোষ হে। আমাকে একমাত্র তুমিই চিনলে মুনসেফ।'

'আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনা।' সুব্বান্না ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলল।

করণম্ এগিয়ে যেতে যেতে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা খুবই সহজ। কুয়োর কাছে ডোম আর মুচিদের মধ্যে ঝগড়া লাগবে। কয়েক-জনের মাথা ফাটবে। কোর্ট কাছারি হবে। ওদের মধ্যে একপক্ষ, প্রদীপের চারদিকে যেমন পোকা ঘোরে, তেমনি আমাদের চারদিকে ঘুরবে। ফলে প্রকাশম্‌ও এতবড় ঘটনায় না জড়িয়ে পারবে না। ভাল

কথা, মুনসেফ, সকালের আগেই তুমি থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেল আর কোর্টের কাগজগুলো তৈরি রেখো। আমি এবার উঠি। আহা সুব্বান্না, কি করছ, গোঁফটাকে পাকাতে পাকাতে উপড়ে ফেলবে নাকি? একটু বিশ্রাম দাও গোঁফটাকে। তোমার এখন অনেক কাজ। তুমিই তো মধ্যমণি হে।'' বলে করণম্ উঠে পড়ল।

'আপনি এগিয়ে যান। আমি আমার সাধ্যমত সাহায্য করব। যত লাগে দেবো।' বলে সুব্বান্নাও উঠল।

সেদিন রাত্রে আটটার সময় প্রকাশম্ ক্ষেত থেকে বাড়ি ফিরছিল। ডোমপাড়ার কুয়োর পাশ দিয়ে আসার পথ। দূর থেকেই সে শুনতে পেল চেঁচামেচি। শুনেই সে তাড়াতাড়ি হেঁটে কুয়োর কাছে এল। কুয়োর কাছে অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। হৈ চৈ, চিৎকার, চেঁচামেচি, ধাক্কাধাক্কি, মারামারি হচ্ছিল। 'আরে থামো, থামো, কি হচ্ছে?' বলতে বলতে প্রকাশম্ ঐ ভিড়ের মধ্যে সোজা ঢুকে পড়ল।

'দেখছেন না, মুচিগুলো এসে আমাদের কুয়োর জল নিতে চাইছে। কিভাবে এসেছে দেখুন। সবাই মিলে, লাঠি-সোটা নিয়ে এসেছে।' ডোমপাড়ার মাতব্বর পুত্রাইয়া বলল।

'তোমরা কি জল নিতে বারণ করেছ?' প্রকাশম্ জিজ্ঞেস করল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওদের দেখাদেখি আমাদের লোকও লাঠিসোটা এনেছে। দেখুন না, মুচিগুলো কিভাবে এসেছে। জল নিতে কেউ লাঠি আনে? আবার আমাদের খোঁটা দিয়ে বলছে, তোমরা মন্দিরে ঢুকতে পার আর আমরা জল নিতে পারি না?' বলল পুত্রাইয়া।

প্রকাশম্ মুচিদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আচ্ছা তোমরা কি আজ করণম্ মশাইয়ের কাছে গিয়েছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ওরা বলল।

'ঠিক আছে, এসো আমার সঙ্গে।' বলে ঐ ডোম ও মুচিদের নিয়ে প্রকাশম্ নিজের বাড়িতে এল। ওদের সবাইকে খিড়কির দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। কাছেই ছিল প্রকাশমদের কুয়ো।

সে ওদের বলল, 'তোমরা প্রত্যেকে এই কুয়ো থেকে জল তোল। তুলে আমাকে দাও, আমি খাব। আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।'

ওরা সবাই কিছুক্ষণ নীরব ছিল। প্রকাশমের বক্তব্য শুনে ওরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করল। তবে ওদের ধমনীতে তখনও কুসংস্কারের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। ঠিক ঐ অবস্থায় ওদের কি করতে হবে তা ওরা ভেবে পাচ্ছিল না।

প্রকাশম্ বুঝল তার কথায় কিছু কাজ হয়েছে। সে যা বোঝাতে চেয়েছে ওরা তা বুঝতে পেরেছে। 'যাদের তোমরা মাতব্বর ভাবছ, গণ্যমান্য মনে করছ তারা নিজেদের স্বার্থ ষোল আনা রেখে, তারপরে তোমাদের কথা ভাবে। তোমরা যে তিমিরে আছ সেই তিমিরেই ওরা তোমাদের রাখতে চায়। কি হোল, জল তোল, আমাকে দাও। আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।' আবেগ মিশ্রিত গলায় প্রকাশম্ বলল।

ওরা প্রত্যেকেই নাড়া পেল। নিজেদের ভুল অনুধাবন করল। পুত্রাইয়া এগিয়ে এসে বলল, 'আমাদের ভুল হয়ে গেছে বাবু। আমাদের কুয়ো থেকে ওদের জল নিতে বলে দিন।'

প্রকাশম্ মহানন্দে বলল, 'শোন ভাই, যে কোন দেশে জাত মাত্র দুটো আছে। যাদের আছে তারা একটা জাত, যাদের নেই তারা অন্য জাত। এ ছাড়া আলাদা কোন জাত নেই। সত্যি সত্যি দিন যদি বদলায়, বদলাবেই, তোমরাও তোমাদের হক্ বুঝে নেবে। কাল সকালে সবাই মিলে এসো। আমি নিয়ে যাবো তোমাদের সবাইকে।'

পরের দিন সাত সকালে ডোম ও মুচিপাড়ার সবাই প্রকাশমের বাড়ির সামনে জড়ো হল। মন্দিরের সামনে এত লোক জড়ো হওয়ার ফলে মনে হল যেন উৎসব লেগেছে। মন্দিরের সামনে কল টিপে কেউ জল খাচ্ছে, কেউ হাত-পা ধুচ্ছে।

না জানি কি ঘটবে ভেবে যারা মন্দিরের কাছে এসেছিল, তারা চোখ বড় বড় করে সবকিছু দেখল। করণম্, সুব্বারাও, মুনসেফ বটতলায় বসে বসে আলোচনা করতে লাগল, শহরে ঠাকুরদেবতার মতই আমা-

দের ঠাকুরেরও সেই ক্ষমতা আর নেই।' এই ধরনের কথা কিছুক্ষণ বলে ওরা যে যার আস্তানায় চলে গেল।

কিন্তু এর ফলে কি হল... ?

মন্দিরের ঠাকুর মন্দিরেই আছে।

মুচিপাড়ার লোক মুচিপাড়াতেই আছে।

ডোমপাড়ার লোক ডোমপাড়াতেই আছে।

গাঁয়ের মাতব্বরা যে যেখানে ছিল সেখানেই আছে।

প্রকাশম্‌ও নিজের ঘরেই আছে।

কোন পরিবর্তন নেই। পরিবর্তনের জন্য এটুকু যথেষ্ট নয় ভাবল কয়েকজন। প্রকাশম্ জীবনে এই প্রথম ভাবতে শুরু করল, তাহলে কি সমাজকে পরিবর্তন করার পথ এটা নয় ?

অরণ্য

ম্লাডাওয়াল্লি

এক বিরাট বড় শহর। আর চারটে শহরের মত সেটি নয়। কারণ অন্য শহরের পথ ঘাট যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এই শহরের পথ ঘাটের অবস্থা সে রকম নয়।

তবে এই শহরে টাকা পয়সার আদান প্রদান খুব বেশি হয়। ব্যবসার কেন্দ্রস্থল। বড় বড় নেতাদের অস্থায়ী বাসস্থান। অসংখ্য কালোবাজারির পীঠস্থান। লক্ষ লক্ষ কেসের ফয়সালা করতে না পারা বহু কোর্টে ভরা এই শহর।

না খেতে পাওয়া মানুষের ভীড় এই শহরেই সব চেয়ে বেশি। ফুটপাতে শোওয়া, প্রতিদিন অমানুষ সৃষ্টিকারী অসংখ্য মানুষের জন্মভূমি এই শহর। খিদের জ্বালায় সারারাত এই শহরের পথে ঘাটে বহু

ছেলে মেয়ের আনাগোনা নজরে পড়ে।

পৃথিবীর বড় বড় দেশ, এই শহরকে ভাল করার জন্য, এই শহরের মানুষের সুবিধার জন্য রাতদিন ভাবছে। ওরা এই শহরের চেহারা বদলাতে আগ্রহী। এর রূপরেখা অপূর্ব শোভা মণ্ডিত করে তুলতে চায় ওরা। বিদেশীরা আগ্রহী হলে দেশের নেতারা কি আগ্রহী না হয়ে পারে ?

এ হেন শহরের এক কোণে লোকটা ছিল। নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলে না। শহরে আসার পর থেকে সে নিজের নাম বলে না। হয় সে নিজের নাম ভুলে গেছে অথবা সে নিজের নাম বলার প্রয়োজন বোধ করে না। একটা জামা তার গায়ে আছে। ছেঁড়া, শতছিন্ন না হলেও, অনেকগুলো জায়গায় সেটা ছিঁড়ে গেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে লালচে রঙ ধরেছে। মনে হচ্ছে আর কদিন পরেই গোটা দাড়িটা সাদা দেখাবে। গায়ের কয়েকটা জায়গায় কিছু কিছু ঘা, খোস, পাঁচড়া আছে। মাঝে মাঝে বিভোর হয়ে সে চুলকায়। নিজেকে রক্তাক্ত করে তোলে। রাত্রে তার হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভিখারীদের ঝগড়া সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে সে খাবার যোগাড় করে।

সে একটা কারখানায় কাজ করত। দুর্ঘটনার ফলে তাকে হাসপাতালে অনেকদিন থাকতে হয়েছিল। প্রথম প্রথম তাকে কেউ কেউ দেখতে আসতো। তারপর আর কেউ এল না।

তার আপনজন বলতে কেউ ছিল না। অল্প বয়সেই সে মা-বাবাকে হারিয়েছিল। কারখানার মাইনে এত কম ছিল যে সে বিয়ে করার সাহস পায়নি। হাসপাতালে তাকে আর রাখল না। সেখান থেকে বেরিয়ে সে কারখানায় গেল। কারখানার খাতায় তার নাম কাটা গেছে। পথে সে হাঁটছিল। খিদে যে মানুষকে এতটা কুঁকড়ে দেয় তা তাকে না দেখলে বোঝা যায় না। না খেয়ে শুয়ে থাকা হয়ত কিছুদিন যায়, কিন্তু পথে হাঁটা যায় না।

তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। নাকটা যেন বেঁকে যাচ্ছে। জিভে টান পড়েছে।

খিদে ছাড়া সে যেন আর কিছুই টের পাচ্ছে না। কিছু শুনতে পাচ্ছে না, কিছু বলতে পারছে না। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। কত গাড়ি তার আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। ঐ শহরের হাজার হাজার জ্বলন্ত সিগারেট যেন তার পেটে জ্বলছে। তার কাছা কাছি সব আছে। মিষ্টির দোকান আছে। ফলের দোকান আছে। মদের দোকান আছে। তার পাশ দিয়ে অনবরত কালোবাজারি, ফট্‌কাবাজ, বড় বড় দেশবরণ্যে নেতা গাড়ি হেঁকে যাচ্ছে।

এবারে ওর নাম আদম সুমারিতে নেই। সে পথে হাঁটে। তার সামনে সামনে হাঁটে আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভয় আর সাহস। ওর সঙ্গে এরা কেউ হাঁটে না। ওর সঙ্গে কেউ থাকতে চায় না। মাঝে মাঝে লোকটা না খেতে পেয়ে মরে যাওয়ার কথা ভাবে। তখন সে ভয়কে কিছুক্ষণ কাছে পায়। সে উপদেশ শুনতে পায়, 'বাঁচতে হলে খাদ্য চাই।'

লোকটা ভাবে, তাহলে খাদ্য জোগাড় করতেই হবে। কিন্তু কি করে? এত কাঁড়ি কাঁড়ি খাবার এসব কি করে পায়? এক একজনের কাছে এত খাবার থাকে কি করে? কতদিনের চেষ্টায় এত খাদ্য এরা জমাতে পারে? আমার মত না খেতে পাওয়া লোক আর কতজন আছে? আমরা কি বরাবর এই রকম ছিলাম? এত ভিখারী এই শহরে এল কোত্থেকে? এরা কি চিরকাল ভিখারী ছিল? নাকি আমার মত, কারখানায় কাজ করত? এই শহরে কত বড় বড় বাড়ি! কত বড় বড় হোটেল! মালিকরা কি করে এসব করতে পারল! আমাদের অবস্থা যদি এত খারাপ হয়, ওদের অবস্থা এত ভাল হল কি করে? অরণ্যে এক জন্তু আর এক জন্তুকে খেয়ে বেঁচে থাকে। বংশ বৃদ্ধি করে। এই শহরেও কি, কিছু লোককে ফতুর করে, কিছু লোক বেঁচে থাকে? হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে ওদের তফাৎ কোথায়? ওরা সব এক। কিন্তু আমরা? আমরা তো সংখ্যায় অনেক বেশি।

তার এই অবস্থা হল কেন? এর জন্য কে দায়ী? কারখানার মালিক? দেশভক্ত নেতা? পার্টি? কে? কারা?

ক্ষুধা, চিন্তা, হাঁটা এসব একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে। কিন্তু সমস্যা থেকেই গেল। ক্ষুধার জ্বালা বাড়তে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ এক অঘটন ঘটে গেল। একটি বারের পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে এক গাদা মাংসের হাড় সহ এঁটো কাঁটা ফেলে গেল একটা লোক। দেখেই সে এগিয়ে গেল। কিন্তু তার আগে পৌঁছে গেল পাঁচ ছটা কুকুর। কুকুরগুলোকে দেখে খুব খারাপ লাগল লোকটার। ওদের জন্য ছেড়ে চলে আসতে ইচ্ছে করল। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা। আগুন জ্বলছে পেটে। কুকুরগুলো তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। লোকটা আশপাশে তাকাল। একটা ইঁট খুঁজে পেলে কুকুরদের মেরে তাড়াবে। কিন্তু পেল না। অতগুলো কুকুরের সামনে, তাদের জন্য ফেলে দেওয়া খাদ্য, সে খাবেই বা কি করে? কিন্তু না খেলে, সে টের পাচ্ছিল, আর বাঁচতে পারবে না। মরতেই হবে তাকে। অতক্ষণ পেটে যে তুষানল জ্বলছিল, তা দাবানল হয়ে গেল। দাবানল সমস্ত পেট আর শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। দাবানল তার শরীরে যে লজ্জা ও ভয় ছিল তা মুহূর্তে পুড়িয়ে ফেলল।

শহরে অরণ্য আছে! মানুষ নামক জন্তুও আছে। তাহলে, লোকটা ভাবল, আমিই বা জন্তুর সঙ্গে জুঝে বাঁচবো না কেন? খিদের জ্বালা মেটাব না কেন?

এখন তার কাছে কুকুরকে আর কুকুর মনে হল না। মনে হল প্রতিদ্বন্দী। তার ইচ্ছে করল চিৎকার করে ডাকতে। তার ডাকে হাজার হাজার লোক ছুটে আসুক। ওরা এলে এই কুকুরগুলো ভয় পেয়ে পালাবে। তখন সে একা একা ঐ বারের নেশায় বুঁদ হয়ে ফেলে যাওয়া খাবার খাবে। তাকে ডাস্টবিনের খাদ্য খেতে দেখে কিছু লোক এগিয়ে আসতে পারে। তাকে সেখান থেকে তুলে গাড়িতে করে নিয়ে যেতে পারে। খাইয়ে পরিয়ে একটা চাকরি পাইয়ে দিতে

পারে।' ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল, 'বাঁচাও।'

কেউ এল না। তার আশপাশ দিয়ে যারা যাচ্ছে তারা যাচ্ছে, যারা আসছে তারা আসছে। 'আমি মানুষ, আমি চিৎকার করছি, কেউ দাঁড়াল না। কেউ আমার দিকে তাকাল না!'

ইতিমধ্যে কুকুরগুলো সব এক সঙ্গে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। একসঙ্গে ওরা ডাস্টবিনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেও তাতে হাত ঢোকাল। কিন্তু আশ্চর্য! একটি টুকরোও সে পেল না। সব মাংস, সব হাড়; সব এঁটো কাঁটা কুকুরগুলোর পেটে চলে গেছে। লোকটা পাগলের মত ডাস্টবিন হাতড়াতে লাগল। কিছুই নেই। লোকটা ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে হঠাৎ একটা কুকুরের ঠ্যাং ধরে ফেলল। এক আছাড় মারল। ঠ্যাং দুটো ধরে চিরে ফেলল। তার মাংস খেতে যাবে, এমন সময় সে দেখতে পেল কয়েক শো লোক, ঐ শহরেরই মানুষ। ওরা সব একটি মানুষের কুকুরের মাংস খাওয়া দেখছিল!

পরদিন বড় বড় পত্রিকায় প্রথম পাতায় বক্স করে 'মানুষের কুকুরের মাংস ভক্ষণ' শিরোনামায় খবরটি বেরুল। কোটি কোটি মানুষ পড়ল, জানল।

কাগুজে বাঘ

এন্. এস্. প্রকাশরাও

'এই বৃষ্টি এক্ষুণি ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।' বললেন নরসিংহম্ মশাই। জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখে তিনি বিরক্ত হন।

কথাটা বরপ্রসাদের কানে গেল এইভাবে—'আমাকে তুই এক্ষুনি ছাড়বি বলে মনে হচ্ছে না।' সে ঘরের একটি সোফায় বসল। বসল বললে পুরোটা বলা হবে না। তার বসাটা এমনভাবে ছিল যেন তাকে

কেউ জোর করে সোফায় বসাচ্ছে আর সে পাছে ভেজা কাপড়ের ছোঁয়া লেগে সোফাটা ভিজে যায়, সেভাবে বসে আছে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সে নরসিংহম্ মশাইয়ের বাড়িতে আসছিল। আর মাত্র কয়েক পা বাকি থাকতেই হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ঐ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সেই বাড়ির দিকে এগোতে লাগল সে। ভেজার ফলে উঁচু করে আঁচড়ানো চুল মাথায় চেপে যেন সেঁটে গেল। তেল চিট্‌চিটে চুল থেকে জল গড়িয়ে মুখের ওপর দিয়ে নিচে পড়তে লাগল। ঐ অবস্থায় সে নরসিংহমের বাড়ির সিঁড়িতে উঠে কলিং বেল টিপল। রুমাল দিয়ে মাথা এবং মুখ মুছতে গিয়ে কলিং বেল টিপে ধরল।

ঐ সময় বাড়িতে শুধু নরসিংহম্ ছিলেন। তাঁর ছেলে এবং বউমা আর নাতি একটা পার্টিতে গিয়েছিল।

কলিং বেল শুনে তিনি নিজেই দরজা খুললেন। খুলেই দেখলেন শ্যামবর্ণ একটা লোক ছাগল ভেজা ভিজে দাঁড়িয়ে আছে। সেই রোগা, ভিজে যাওয়া, পাগলের মত চুলের লোকটাকে ভেতরে আসতে বলবেন, না 'কাকে চাই' বলে জিজ্ঞেস করবেন, ভেবে না পেয়ে, দরজাটা ধরে, কয়েক মুহূর্ত তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

নরসিংহম্‌কে দেখেই বরপ্রসাদের মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। বাঘ দেখার মত চমকে উঠে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। তার দাদু তাকে পই পই করে বলেছিলেন, দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করতে। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোন কিছুই মনে পড়ল না। তাঁর মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে না জানি কেন বরপ্রসাদ ভীষণ ঘাবড়ে গেল।

হঠাৎ মুখের হাবভাব বদলে ফেলার অভ্যেস নরসিংহমের আছে। তিনি তাঁর ছোট নাতির সঙ্গে খেলতে খেলতে, হাসাহাসি করার সময়, সামনে হঠাৎ চাকর এসে গেলে ঝট্ করে মুখের হাবভাব বদলে ফেলেন। কোন কিছু তাকে বলতে হলে গুরু গম্ভীর গলায় বলতে পারেন। তিনি মক্কেল ও জজের সঙ্গে যতটা হাসিমুখে কথা বলতেন গাঁয়ের চাষী মজুরদের সঙ্গে ঠিক ততটাই গাম্ভীর্য বজায় রেখে কথা বলতেন। যে

কোন নতুন লোককে দেখলে তাঁর মুখের হাবভাব চোখের পলকে বদলে যায়। অন্যের মুখ দেখেই তিনি যেন বুঝতে পারতেন আগন্তুকের আসার কারণ। তারপর কখনও তার মুখ প্রসন্ন দেখাত আবার কখনও গম্ভীর। অন্যের মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের বক্তব্য অনুধাবন করার অসীম ক্ষমতা ছিল তাঁর।

কিন্তু বরপ্রসাদের মুখ দেখে তিনি কিছুই অনুমান করতে পারেননি। ফলে মুখটাকে গম্ভীর করে ফেলবেন না হাসিমুখে কথা বলবেন বুঝে উঠতে পারেননি। এমন সময় আগন্তুক একটি চিঠি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল। চিঠি পড়ে তাঁর মুখ ক্রমশ প্রসন্ন হল। তিনি বললেন, "এস, ভেতরে এস।"

বরপ্রসাদের মনে হল, আসার উদ্দেশ্য অর্ধেক পূরণ হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই নরসিংহমের মুখে, 'জুতোটা...' শুনে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেতে হল তাকে।

আগন্তুকের জুতোজোড়া ভিজে গিয়েছিল। জুতোয় কাদাও লেগে-ছিল। বরপ্রসাদ মনে মনে ভাবল, জুতো নিয়ে ঢুকে পড়লে না জানি কি সর্বনাশ হত!

বাইরে জুতো রেখে, ভেতরে ঢুকে, আলতোভাবে বসার সঙ্গে সঙ্গে নরসিংহম্, 'ভালোভাবে বসো' বলতে গিয়েও বললেন না।

বরপ্রসাদের দাদু নরসিংহমের সহপাঠি ছিলেন। ওরা নিজেদের মধ্যে, সেই বাচ্চা বয়সেই বলাবলি করত, 'লেখাপড়া না করে আমাদের কোন উপায় নেই। যেকোন ভাবে আমাদের লেখাপড়া করতেই হবে। দুজনেই অনেক কষ্টে লেখাপড়া করেছেন। কিন্তু ঐ যে কথায় আছে, 'সবদিন সকলের সমান যায় না।'

নরসিংহম্ বাচ্চা বয়সেই এক উকিলের নজরে পড়ে গেল। নরসিংহম্ও বাচ্চা বয়স থেকেই এমনভাবে নিজেকে তৈরি করেছিলেন যে প্রয়োজন হলে তিনি বিনা দ্বিধায় বলতে পারতেন, 'আমার মা নেই, বাবা নেই, ভাইবোনও নেই, আপনজন বলতে তিনকুলে আমার কেউ

নেই।' এহেন এক করিৎকর্মা চতুর ছেলেকে না জানি কেন ঐ উকিলের ভীষণ ভাল লেগে গিয়েছিল।

কয়েক বছর পরে উকিল নরসিংহমকে ঘরজামাই করে ফেললেন। তারপর তাকে পাঠিয়ে দিলেন মাদ্রাজে 'ল' পড়তে। পড়ার শেষে নরসিংহম্ শ্বশুরের জুনিয়র হয়ে প্র্যাকটিস্ করতে লাগলেন, অনেক জায়গায় সগর্বে শ্বশুরের সঙ্গে ঘুরেছেন।

নরসিংহমের ভগবানের প্রতি ছিল অসীম ভক্তি। তবে তিনি সম্ভবত তার চেয়ে বেশি ভক্তি পোষণ করতেন শ্বশুরের প্রতি। পঁয়তাল্লিশ মিনিট কারোর সঙ্গে কথা বললে তার মধ্যে আধঘণ্টা তিনি শ্বশুরের প্রসঙ্গ অবশ্যই আলোচনা করতেন।

নরসিংহমের এখন তিন তিনটে ছেলে। তাঁর বড় ছেলে বোম্বাইয়ের কোন এক বড় ওয়েল রিফাইনারিতে জেনারেল ম্যানেজারের নিচের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে আছে। এই নিয়ে নরসিংহমের অতৃপ্তি ও দুঃখ আছে। জেনারেল ম্যানেজার না হলে যেন তার এই অতৃপ্তি কাটবে না। তাঁর দ্বিতীয় ছেলে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্চারার। যতদিন না এই ছেলেটি অধ্যাপক হচ্ছে ততদিন যেন তাঁর মন ভরছে না। মাঝে মাঝে তাঁর ইচ্ছে করে কয়েকজন অধ্যাপকের গলা টিপে মেরে ফেলতে। কারণ কিছু অধ্যাপক মরলে তাঁর ছেলে অধ্যাপক হতে পারবে। তৃতীয় ছেলেটি আমেরিকায় রিসার্চ করছে। শুধু একবার 'আমেরিকায় ছাত্র বিক্ষোভ' দেখে কয়েকদিন ঘাবড়ে গেলেও ছোট ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নরসিংহমের মনে কোন সন্দেহ নেই।

নরসিংহম্ যে বাড়িতে জন্মেছিল সে বাড়ির সবাই ভেবেছিল, নরসিংহম্ ভাল করে লেখাপড়া করবে, বড় হবে, রোজগার করবে, পরিবারের দুঃখদুর্দশা কাটাবে। কিন্তু ভাবী শ্বশুরের পাল্লায় পড়ে নরসিংহম্ রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করে শ্বশুরের সঙ্গে থাকতে লাগলেন।

তাঁর দিদির বয়স বেড়ে যেতে লাগল। টাকা পয়সার অভাবে তার বিয়ে হল না। শেষে একদিন সে আত্মহত্যা করল। তাঁর দ্বিতীয় বোন

এক বুড়ো উকিলের সঙ্গে তৃতীয় বউ হিসেবে তার সঙ্গে থাকতে লাগল। নরসিংহমের দাদা যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে ভুগতে ভুগতে মারা গেল। তার বউ ছেলেমেয়ে কোথায় যে গেল, বেঁচে আছে কি মরে গেছে, তা কেউ জানে না। নরসিংহমের বাবা অল্প বয়সে মারা গেলেও মা কিন্তু বহু বছর বেঁচে ছিল। একেবারেই বুড়ি হয়ে গিয়েছিল, নড়তে চড়তে পারত না। কাপড় বদলে পরারও ক্ষমতা ছিল না। দু-চারদিন অন্তর পাড়ার লোক, 'এবার মরে যাবে, আর বাঁচবে না', বলে তাকে বাইরে শুইয়ে দিত। শেষে এমন হল বারান্দায় তাকে শুইয়ে দেওয়ার পর, বেঁচে থাকতেই তার গায়ে পিঁপড়ে উঠল, মাছি বসল। শেষে ঠাণ্ডা লেগে প্রাণটাকে ঠাণ্ডা করে বুড়ি দীনবন্ধু ভগবানের কাছে পৌঁছে গেল।

ঠিক সেই সময়েই বরপ্রসাদ রাওয়ের দাদুর অবস্থা দ্রুত পড়ে গেল। তাঁর বাবা মারা গেলেন। ফলে ইণ্টারমিডিয়েট হতে না হতেই তার লেখাপড়ায় ছেদ পড়ল। পরে প্রাণের দায়ে ছোট ছোট অনেক ধরনের চাকরি তাকে করতে হল। দিন এনে দিন খাওয়া অবস্থা জেনেও দাদুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে একজন এগিয়ে এলেন। দাদুর বিয়ে হল। তার ছিল দুটি মেয়ে এবং একটি ছেলে।

ছেলে কারখানায় পা হড়কে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেল। কারখানার মালিক আইনের প্যাঁচে ফেলে, বুঝিয়ে শুনিয়ে সামান্য কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ দিল তার স্ত্রীকে। স্ত্রী ঐ টাকা নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। দ্বিতীয় মেয়ের শ্বশুরবাড়ি ভালই। তবে বড় বউয়ের স্বামী একটু অস্থির। একমাস কাজ করলে দু মাস কাজ করে না। তারপর যখন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সেই ঘরে অর্থাৎ তারই পাঁচটি কাচ্চাবাচ্চা। ঐ পাঁচজনের মধ্যে যে বড় তার নাম বরপ্রসাদ রাও।

বরপ্রসাদ মামার বাড়িতেই—মামার বাড়ি না বলে দাদুর বাড়ি বলাই ভাল। দাদুর খরচেই বি. এস্. সি. পর্যন্ত পড়তে পারল। অতদূর পড়তেই অঢেল টাকা খরচ হয়ে গেল। তার বেশি পড়ানোর ক্ষমতা দাদুর ছিল না। তাই লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে বরপ্রসাদ

চাকরির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে লক্ষ্য করল, এক কথায় কেউ না বলছেন না। কেউ ঘুষ চায়, কেউ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যোগ্যতা জিজ্ঞেস করে, এমন কি তার জাত, গোত্র, আত্মীয়-স্বজনদের নাম ইত্যাদিও জিজ্ঞেস করে। অনেকে অনেক কিছু জানতে চাইল কিন্তু বরপ্রসাদ যা চেয়েছিল তা কেউ দিল না।

গোদাবরী নদীর জোয়ারে ভাসমান মানুষ যেমন খড়-কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা করে, তেমনি এই সময়ে দাদুর মনে পড়ে গেল নরসিংহমকে। দাদু নরসিংহম্ সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধরে এত কথা বললেন যে বরপ্রসাদের মনে হল দাদুর সঙ্গে নরসিংহমের গলায় গলায় বন্ধুত্ব ছিল। এখন নরসিংহমের যা অবস্থা তাতে তাঁর সঙ্গে একমাত্র কল্পবৃক্ষ অথবা কামধেনুর তুলনা করা চলে। দাদুর চিঠি নিয়ে বরপ্রসাদ সোজা নরসিংহমের কাছে চলে এল।

দাদুর চিঠির মোটামুটি বয়ান ছিল এই ধরনের ঃ

‘এই ছেলেটি আমার নাতি। এর বাবা নিখোঁজ হয়ে গেছে। ফলে এদের অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। তোমার ছেলেদের মাধ্যমে অথবা তোমার জানাশোনা কোন লোকের মাধ্যমে, ছোট হোক, বড় হোক, একটা চাকরি যদি জোগাড় করে দিতে পার, আমি জন্ম-জন্মান্তর তোমার কাছে ঋণী থাকব। এর বোনগুলো বড় হয়ে গেছে। এই-ই বড় ছেলে। ফলে এর ঘাড়েই পড়েছে সমস্ত দায়িত্ব। আমি নিজেই যেতাম কিন্তু কদিন ধরে পায়ের ব্যথায় বড় কষ্ট পাচ্ছি। আশা করি, কুশলে আছো।’ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বরপ্রসাদ রাও সোফার উপর বসতে গিয়েও দু তিনবার ওঠবোস করার মত করল। মাথা তুলে দেখলেন নরসিংহম্। ঐ চিঠি পড়ছেন। তার পেছনে, দেয়ালে টাঙানো বড় ছবি দেখে বরপ্রসাদ চমকে উঠলেন।

ছবিটি সুন্দর একটা ফ্রেমে আঁটা রয়েছে। কোন এক মহান পুরুষের ছবি হবে। ভদ্রলোকের মুখ গম্ভীরভাবে রাখতে গিয়ে এমন হয়ে গেছে যে, ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। মাথায় বিরাট পাগড়ি বাঁধা।

ফলে মাথাটাকে দেখাচ্ছে বিস্তৃত। কপালে কুমড়োর বিচির মত একটি তিলক আছে। চোখগুলো উজ্জ্বল। গোঁফে এত পাক দেওয়া আছে যে মনে হচ্ছে যাত্রার গোঁফ। গোঁফটা যেন তার নিজের নয়। কালো একটা কোটের ভেতর থেকে মুখটা যেন জেগে উঠেছে। গলায় যেন চুল লাগানো আছে।

ঐ ছবির বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন ওটার দিকে তাকাতে বরপ্রসাদের ভয় করল।

নরসিংহম্ চিঠি পড়ে টিপয়ের উপর রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বরপ্রসাদ অন্তমনস্ক ছিল। হঠাৎ তার মনে হল দীর্ঘনিশ্বাসটা ঐ ছবি থেকে বেরিয়ে আসছে। সে চমকে উঠল।

'হুঁ, তাহলে—তোমার দাদুর শরীর এখন ভাল আছে তো? অফকোর্স ওল্ড এজ্। আমারই বয়সী তো। আমারও শরীরটা এর মাঝে ভাল ছিল না। ছেলেরা আমাকে কোর্টে যেতে বারণ করল। তাই বন্ধ করে দিয়েছি কোর্টে যাওয়া···তোমার দাদু এখনও কি কোন কাজকর্ম করছে?...' বলতে বলতে নরসিংহম্ অন্তমনস্ক হয়ে গেলেন। বরপ্রসাদ চুপচাপ বসেছিল। সে ভাবছিল, হাতটা কোথায় রাখা যায়। সোফার উপরে হাত রাখা অসভ্যতা, আবার হাঁটুর উপরে হাত রাখলে বসার অসুবিধা হয়। তাছাড়া হঠাৎ তার আর একটা কথা মনে পড়ল। মনে পড়তেই তার মনে হল মস্তবড় অপরাধ সে করে ফেলেছে। দাদু বার বার বলে দিয়েছিলেন দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করতে। এত-ক্ষণ কথা বলার পর উঠে প্রণাম করলে খারাপ দেখাবে। হঠাৎ তার মুখ থেকে চুকচুক শব্দ বেরিয়ে গেল।

'আমি ইচ্ছে করলে যে কোন লোককে বলতে পারি। তবে কি জান—দিনকাল তো আগের মত নেই। সামনে বলবে আচ্ছা স্যার, অবশ্যই করব স্যার। কিন্তু হারামজাদাগুলো পরক্ষণেই ভুলে যাবে। হ্যাঁ, আগেকার দিনে কথার দাম ছিল। যাকে যা কথা দেওয়া হত, সেই কথা অনুযায়ী কাজ হত। আমার আবার কি জান, আমি একজনকে

বলব, সে যদি শেষ পর্যন্ত না করে, আমার মনে হয় আমাকে ইনসাল্ট করছে। আমি বলব অথচ হবে না, এমন লোককে বলাই আমার পছন্দ নয়। আমার ছোট ছেলে এখন অবশ্য লেকচারার, তবে যে কোনদিন প্রফেসার হয়ে যেতে পারে। তবে ওর হাতে, এখনই কাউকে নেওয়ার মত ক্ষমতা আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার ধারণা, কাউকে কাজে নেওয়ার মত ক্ষমতা তার আদৌ নেই। ওর ওপরে একজন আছে তো। ছেলে আমার এখন বাড়িতে নেই। ঐ ওপরওয়ালার ছেলে আর ছেলের বউ ওয়েস্ট জার্মানি থেকে ফিরেছে। তাই ওদের দেখতে গেছে। অবশ্য এসব তো করতেই হয়। ওর হাতে যদি ক্ষমতা থাকত আমি আজকেই তোমার ব্যবস্থা করে দিতাম। আমার ছেলে, ঠিক আজকালকার ছেলেদের মত নয়, প্রত্যেকটা ব্যাপারে আমার সঙ্গে কনসাল্ট করে। আমার অনুমতি ছাড়া এক পাও ফেলে না।' বলতে বলতে তিনি আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

এই সময় কি যে বলা উচিত, ভাবতে না পেরে বরপ্রসাদ চুপচাপ বসে রইল। বসে বসে সে ভাবতে লাগল, এই বুড়োটা এত কথা কখনো কি কাউকে বলেছে! এতে কি লাঠি ভাঙে, না সাপ মরে! ঐ দেওয়ালের উপর থেকে বিড়ালটা কি নামবে না? না, তেলে জলে আমার মুখটা চট্‌চটে হয়ে গেছে। এখন এঁর সামনে রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিলে হয়ত ভাববেন, ছোঁড়াটা বকে গেছে।

'দিনকাল যা পড়েছে, বলার নয়। সবকিছুর অভাব। চাকরির অভাবের তো কথাই নেই। আই টেল ইউ ওয়ান থিং, আমি এতদূর পড়েছি, অত পাশ করেছি, এসব চাকরি আমার করা উচিত নয়, এতে আমার পোষাবে না—এসব ভেবে কোন লাভ নেই। যে কোন একটা চাকরি ধরে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয়। উন্নতি হবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না। টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি, আমার ছেলেদের জন্য আমি কাউকে ধরাধরি করিনি। ওদের যতদূর ইচ্ছা, পড়তে দিয়েছি, তারপর ভগবানের দয়ায় নিজের থেকেই ওদের চাকরি জুটে

গেছে। কোন ছেলেকেই এক পয়সা পাঠাতে বলি না। আমার ফাদার-ইন-ল এখানেই প্র্যাকটিস করতেন। আমিও এখানেই করেছি। তাই এখানকার সবকিছুর ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, আমার বড়ছেলের ছেলে-মেয়েরা যখন তখন চিঠি লেখে। গ্রাণ্ড ফাদার, আমাদের বাড়িতে এসো। ভাবছি, বোম্বাইয়ে কিছুদিন ওদের বাড়িতে থেকে আসব। কিন্তু খবরটা ছোট ছেলের কানে পৌঁছে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। এমনিতেই প্রত্যেক চিঠিতে সে আমাকে আমেরিকায় যেতে বলে। তুমি বোধহয় আমার ইয়ঙ্গেস্ট সান্‌কে দেখেছ…' কথাটা বলতে বলতে নরসিংহম্‌ আমার দিকে তাকালেন।

হয়ত ছোটছেলের মুখ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তাই তিনি আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

বাইরে অন্ধকার আরও ঘন হল। বৃষ্টি তখনও পড়ছিল। হয়ত সোফার পেছনের দিকে বৃষ্টির ছাঁটও পড়ছিল।

'জানি না, কি করে সে তার দাদুকে বাচ্চা বয়সেই বলেছিল, "আমি আমেরিকায় যাবো।" ঐটুকু বাচ্চার মুখে "আমেরিকায় যাব" শুনে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অফকোর্স তাকে ভাগ্যবান বলতে হবে। আমেরিকায় যাওয়ার ভাগ্য কজনের হয়। স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য পরীক্ষা দিল। ওরা কি অত সহজে স্কলারশিপ দেয়। না পেয়ে ওর জিদ আরও বেড়ে গেল। কোত্থেকে যে ঠাকুরের দয়ায় টাকা জুটে গেল, ব্যস্‌ একদিন সে, "বাবা চললাম" বলে চলে গেল। আজকাল তো চিঠিতে লেখে, "বাবা, ভাবছি, এখানেই সেটেল্‌ হয়ে যাব।" আমি বারণ করিনি। দেখ বাবা, আমার মতে, আজকালকার দিনে, এটা আমার দেশ, ওটা আমার দেশ, এই মনোভাব থাকা উচিত নয়। আজ যদি আমার কোন ছেলে কাছে এসে বলে, বাবা আমি চাঁদে যাব; আমি বলব যাও। ছেলে তো আমার, তিনমাসে একবার, আমেরিকা থেকে এসে ঘুরে যেতে পারে। আমাকে না দেখলে ওর যেন শান্তি হয় না।…' বলতে বলতে নরসিংহম্‌ আবার অন্যমনস্ক

হয়ে গেলেন। হয়ত, ছোট ছেলেকে তাঁর ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল।

তাঁর কথা শুনতে শুনতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম, আমি কার ছেলে। আহা, ইনি যদি আমার দাদু হতেন! ভদ্রলোক কত উদার। সব কথা খোলাখুলি বলছেন।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বরপ্রসাদের মনে হল তার পেছনের জানলাটা খুলে গেছে। তার পিঠে জলের ছাঁট লাগছে।

বিদ্যুৎ চমকে উঠল। মেঘের গর্জনও শোনা গেল।

'বৃষ্টির ছাঁট আসছে বোধহয়!' নরসিংহম্ বললেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আসছে।' বলে পেছন দিকে ঘুরে গিয়ে বরপ্রসাদ পেছনের জানালাটা বন্ধ করে দিল। বন্ধ করার সময় কাঁচের জানালার এমন আওয়াজ হল যেন কেউ তাকে থাপ্পড় মেরেছে। হঠাৎ বুকটা তার ধক্ ধক্ করতে লাগল।

জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বরপ্রসাদ বলল, 'এই বৃষ্টি এখনি ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।'

দূরে কোথাও বাজ পড়ল। তাঁর কথাটা বরপ্রসাদের কানে গেল, 'আমাকে তুই এক্ষুনি ছাড়বি বলে মনে হচ্ছে না।' বরপ্রসাদের মাথা ভার হয়ে গেছে। টন্‌টন্ করছে ঘাড়। মাথাটা কেটে নিচে রেখে দিলে যেন তার স্বস্তি হত। একটু একটু শীতও করছিল তার।

বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। মাঝে মাঝে সমস্ত আকাশের বুক চিরে যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। পথের ধারে বৈদ্যুতিক আলোর থামে বেঁধে রাখা মোষ ভিজছিল। তার সামনে যে খড় ছিল তা ভেসে চলে যাচ্ছে। মোষটা অপলক চোখে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে। হয়ত শীতে অথবা ভিজে একটি কুকুর কেঁউ কেঁউ করে ডাকছে। কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আবার এসে বসলেন নরসিংহম্।

কিসের যেন টুং টাং আওয়াজ হল। হয়ত বিড়াল লাফ দিয়ে ইঁদুর ধরছে। হয়ত সেই সময় কাপে ডিসে ঠোকাঠুকি হয়েছে।

ভেজা চুলে বসে থাকা বরপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে নরসিংহমের বলতে

ইচ্ছে করল, 'মাথাটা মুছে নাও।' কিন্তু তিনি তা বললেন না। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'আমার কাদার-ইন-ল কে তুমি জানতে?'

অসহায়ভাবে বরপ্রসাদ নরসিংহমের দিকে তাকাল। হঠাৎ ঘুরে তিনি পেছনের ছবির দিকে তাকালেন। ছবির দিকে তাকাতে তাকাতে তাঁর মুখমণ্ডল গৌরবদীপ্ত হয়ে উঠল।

বরপ্রসাদ আবার ঐ ছবির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তার মনে হল ছবির ঐ লোকটা হাসার চেষ্টা করছে। সেই হাসি যেন মৃত মানুষের মুখের হাসি। ভয়ঙ্কর দেখাল সেই হাসি। ঝট্ করে সে চোখ বুজে ফেলল। নরসিংহম্ গলা ঝেড়ে বললেন, 'তুমি জানবে কি করে! তবে তোমার দাদু জানেন। এহেন মানুষ শয়ে নয়, হাজারে নয়, কোটিতে একজন মেলা ভার। কত যে বই পড়েছেন! অগাধ জ্ঞান! তার দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হত, শত চেষ্টা করেও, তাঁর জ্ঞানের একশ ভাগের এক ভাগও কি পাব! কি বলব, পাব না। এ জীবনে হবে না। এখনও তাঁর আমি কিছুই একশ ভাগের এক ভাগও, পেলাম না। এতবড় পণ্ডিত জীবনে আমি কাউকে দেখিনি। এখনকার দিনে দুপাতা পড়েই বলবে, "ভূত ভগবান বলে কিছু নেই।" জানিনা, এসব ব্যাপারে তোমার বিশ্বাস আছে কিনা। কি বিশ্বাস আছে তো?' নরসিংহম্ প্রশ্ন করলেন।

বরপ্রসাদ কি যেন জবাব দেওয়ার জন্য কতকগুলো শব্দ পেট থেকে গলা পর্যন্ত এনেছিল। কিন্তু শব্দগুলো সেখানেই জড়াজড়ি করে আবার পেটে নেমে গেল।

না জানি কি ভেবে নরসিংহম্ আবার শুরু করলেন, 'কথা উঠল তাই বলছি। আমার ছেলে, আমার বউমা,.তার ছেলেমেয়ে, প্রত্যেকেরই লেখাপড়ার দিকে খুব ঝোঁক। বড় ছেলে তো আমার বছরে একবার তিরুপতি যায়। মাথা ন্যাড়া করে পূজো দেয়। যেমন আমার উপর তার ভক্তি, তেমনি ঠাকুর দেবতা বলতেও সে অজ্ঞান।'

বরপ্রসাদের ঠোঁট কাঁপছিল। কোন কথা বলার প্রয়াসে নয়, শীতে।

'উনি যখন কোর্টে যেতেন কোন্‌টা কত পয়সার কেস সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। যেদিন আমি প্রথম কোর্টে গিয়েছিলাম উনি বলে-ছিলেন, "দেখ বাবা, আমার বিষয় সম্পত্তির কোন অভাব নেই, আমার আর রোজগার করে কি দরকার—এসব ধারণা করা ঠিক নয়। দু-পয়সা হোক, দু টাকা হোক, দুশো টাকা হোক যত্ন করে ঘরে আনতে হয়। মনে রেখ, রাই কুড়িয়েই বেল হয়। এই যে কেস আমরা পাই, এগুলো সব তাঁর দেওয়া কেস। কোন কেসকেই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।..." তাঁর বাণী অক্ষরে অক্ষরে মনে রেখেছি, বর্ণে বর্ণে তা পালন করার চেষ্টা করেছি। তার পর থেকে কত খুনীকে বাঁচিয়েছি, কত নিরপরাধীকে ফাঁসিয়েছি। এ না করে তো আমার উপায় ছিল না। কারণ রাই কুড়িয়েই তো বেল হয়।' অনেকক্ষণ পরে নরসিংহমের মনে হয়েছিল, হয়ত তিনি বড্ড বক্‌বক্‌ করছেন।

হঠাৎ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এখন সেসব কথা ভাবলে আমার নিজেরই হাসি পায়। একবার কি ঝোঁক চেপেছিল, তাঁকে প্রশ্ন করে-ছিলাম, খুনীকে বাঁচালে, দুষ্টের দমন কি করে হবে? এটা তো পাপ! আমার এ প্রশ্নে, অন্য কেউ হলে হয়ত ভীষণ রেগে যেত। কিন্তু তিনি একগাল হেসে বললেন. "ওরে পাগল, দুষ্টকে দমন করার জন্য তিনিই স্বয়ং নেমে আসবেন। আমরা দমন করার কে? আমাদের দিয়ে তিনি যে কাজ করাতে চান, আমরা সেই কাজই করছি।' নরসিংহম্‌ হঠাৎ কথা শেষ করলেন।

বরপ্রসাদের চোখ পড়ল তাঁর পেছনের ছবির উপর। তার মনে হল, ছবি বলছে, 'আমাকে যে মেরেছে আমি তার প্রতিশোধ নেব। আমি এত তাড়াতাড়ি মরতে চাইনি।'

'এত কথা কেন বললাম জান, আমি তোমাকে জানাতে চাই যে তিনি শুধু আইনের বই পড়েছেন তা নয়। ধর্ম, বিজ্ঞান সমস্ত ব্যাপারে যত বই আছে সব তিনি পড়েছেন। শুধু পড়েছেন আর পড়েছেন। কতদিন যে তিনি কোর্ট কাছারি ছেড়ে বই নিয়ে পড়েছেন তার হিসেব নেই।

এই যে ছবি এ তো তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তোলা…' ঝপ্ করে তিনি থেমে গেলেন।

বাইরে কাদের কথা শোনা গেল। পরক্ষণেই কড়া নাড়ার শব্দ হল। নরসিংহম্ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কলিংবেল আছে, তবু কড়া নাড়বে!' বলে তিনি উঠে দরজার দিকে গেলেন। বরপ্রসাদ ভাবল, একটু ভাল করে বসা যাক। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, এতক্ষণ গুটিয়ে বসে থেকে হঠাৎ এখন পা ছড়িয়ে বসলে না জানি তিনি কি ভাববেন।

বাইরে আলো জ্বেলে নরসিংহম্ দরজা খুললেন। দরজা খুলতেই তাঁর নজরে পড়ল, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটি বুড়ো এবং একটি মেয়ে। ওরা লক্ষ্য করেনি নরসিংহমের মুখের হাবভাব। মেয়েটা বলল, 'আমার দাত্তুর জ্বর হয়েছে। ভিজে কাঁপছে, একটু ভেতরে বসব?'

নরসিংহমের চোখ যেন রাগে জ্বলে উঠল! কি যেন ভেবে বললেন, 'কে তোমরা? কি চাও?'

'আমার দাত্তুর জ্বর হয়েছে, একটু ভেতরে বসব বাবু? বৃষ্টি থেমে গেলে চলে যাব।' কোথায় যেন বাজ পড়ল। কি বলবেন ভেবে না পেয়ে নরসিংহম্ বললেন, 'দাঁড়িয়ে থাকো না কেন ওখানেই। কে তোমাদের বারণ করছে?'

'এখানে বৃষ্টির ছাঁট আসছে বাবু। আমার দাত্তুর জ্বর হয়েছে। ভেতরে একটু বসব বাবু? বৃষ্টি থেমে গেলে চলে যাব।' মেয়েটি বলল।

'বলে কি? ঘরে ঢুকতে চাইছে! বাইরে দাঁড়াতে দিয়েছি তাতে হচ্ছে না?' বলে নরসিংহম্ এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন।

'ঠিক আছে বাবু, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব।'

এই কথা শুনে নরসিংহম্ দ্রুত গিয়ে সোফার উপর বসলেন।

'দেখেছ, ব্যাটাদের সাহস দেখেছ! ভেতরে আসতে চায়। এটা কি ধর্মশালা? ওর বাপের বাড়ি! বুড়োটা যে কোন সময়ে ঝপ্ করে মরে যাবে। বাইরে দাঁড়াতে দিয়েছি এতে হচ্ছে না। ভেবেছে একটু খোসামোদ করলেই আমি ভুলে যাব, ভেতরে ঢুকতে দেব। বুড়ো

ব্যাটা কাঁপছে। ঘরে ঢুকেই হয়ত মরে যাবে। না জানি কি রোগে ভুগছে ব্যাটা, বলে কিনা জ্বর। ওকে ঢোকানো মানেই তো রোগজীবাণু ঘরে ঢোকানো। ভিখিরিদের আবার রোদবৃষ্টি কি। আমি তো বারান্দায় দাঁড়াতে দিয়েছি। অন্য কেউ হলে দূর করে দিত। বুড়োটা ভিজে গেছে বটে, তবে দরজা খুলতেই ঐ যে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে, ওটা ঢং। জানে নাতো কিচ্ছু, লেখাপড়া করলে তো! ও ভেবেছে, ওতেই আমি গলে যাব।' কিছুক্ষণ নরসিংহম্ থামলেন। হয়ত এতবড় ব্যাপার আবিষ্কার করে তিনি মনে মনে তৃপ্তিলাভ করেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে মাথা ঘুরিয়ে শ্বশুরের ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

'কে বলতে পারে, হয়ত ব্যাটারা চোর। আজকাল চোরগুলো হাজার রকমের কায়দা করছে। চোর দেখলেই মারা উচিত। ব্যাটাদের পুড়িয়ে ফেলা উচিত। এক একবার আমার ইচ্ছে করে, দেশের সমস্ত চোরকে ধরে লাইটপোস্টে ঝুলিয়ে দিতে।' বলতে বলতে নরসিংহমের মুখ রক্তিম হয়ে উঠল।

বৃষ্টি আরও বাড়ল। বিদ্যুৎ চমকাল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওরা যে কি বলছে, শোনা গেল না।

এমন সময় আবার দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

বরপ্রসাদ ভাবল উঠে গিয়ে দরজা খুলবে কি না। কিন্তু ততক্ষণে নরসিংহম্ দরজার কাছে পৌঁছে গেলেন। তিনি এমনভাবে দরজা খুললেন যেন তাঁর সমস্ত রাগ দরজার উপর আছড়ে পড়ল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া ঢোকার মত ঘরে ঢুকে গেল ঐ দুজন। 'আরে, একি! হোয়াট ইজ দিস্? বারণ করেছি, তোমরা মানুষ না পশু?'

বুড়োটা কোন কথা বলল না। মেয়েটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। বরপ্রসাদ তাদের দিকে তাকাতে না পেরে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল।

ওরা কোন কথা না বলায় নরসিংহমের রাগ আরও বেড়ে গেল। তিনি গর্জে উঠলেন, 'বেরোও ঘর থেকে। না বেরোলে আমি এক্ষুণি

পুলিশ ডাকব। গেট আউট, কুইক।'

মেয়েটা তখনও কোন কথা বলল না। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। দরজাটা খোলাই ছিল। ফলে বৃষ্টির ছাঁট ঘরে ঢুকছিল। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছিল যেন ঘরে। নরসিংহম্ লেজের ওপর দাঁড়ানো সাপের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। হাতের লাঠিটা একপাশে রেখে মেয়েটা তার দাদুকে এক কোণে গুছিয়ে বসাল। সে ভিক্ষের ঝুলি ও থালা রাখল নিচে। বাঁধা চুল খুলে মেয়েটা চুলের জল ঝাড়তে লাগল।

'রাস্কেল্! স্টুপিড! তোমরা এভাবে যাবে না। পুলিশ দিয়ে তোমাদের বের করে দিতে হবে।' বলে নরসিংহম্ ফোনের কাছে গেলেন।

এদিকে ভিখিরি মেয়েটা চুল বেঁধে, কোমরে আঁচল কষে একটু এগিয়ে এল। ঠিক সেই সময়ে বরপ্রসাদের মনে হল, 'কোন যাদুকর এসে এই মুহূর্তে যদি আমাকে ইন্দ্রজালের সাহায্যে তুলে নিয়ে যেত, তাহলে বেশ হত।'

'কি পুলিশ ডাকব, পুলিশ ডাকব, করছেন বাবু? অত ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন কেন? ডাকুন, ডাকুন না। এ ছাড়া তুমি আর কি করতে পারবে? ওদের ওপর তোমার হাত আছে। তাই ডাকো। পুলিশ ডেকো না হলে, মিলিটারি ডাকো। আমরা কি করেছি? তোমাকে গাল দিয়েছি না মেরেছি? আমরা কি তোমার বাড়ি তুলে নিয়ে যাচ্ছি? তোমার কাছে কাপড় চেয়েছি না টাকা চেয়েছি? বুড়োটা কাঁপতে কাঁপতে মরে যাবে, তাই একটু ভেতরে আসতে চেয়েছি। বৃষ্টি থেমে গেলে চলে যাবো। এই তো! এর বেশি কি চেয়েছি?'

'হয়েছে, হয়েছে। অনেক লেক্‌চার মারতে শিখেছ। যাও, যাও, বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।' ফোন তুলতে তুলতে নরসিংহম্ বললেন।

'অ, সম্মান দিয়ে কথা বলছি তো, তাই বাবুর দেমাক দেখানো হচ্ছে। বেশ দেখাও, কত দেমাক দেখাবে। আমরা এই বসলাম। যতক্ষণ না বৃষ্টি থামে, নড়ব না। তোমার যা ইচ্ছে কর। বৃষ্টি থামবে, তারপর আমরা বাইরে পা রাখব। ডাকো, কাকে ডাকবে ডাকো,

প্রাণভরে ডাকো। পুলিশ ডাকো, মিলিটারি ডাকো। দাদু, অলকাকে বলো। বলো ভাল করে।' বুড়োটা কাঁপতে কাঁপতে উঠতে গেল। কিন্তু মেয়েটা তাকে বসিয়ে দিল।

নরসিংহম্ ফোন নামিয়ে রেখে দিলেন। মেয়েটার তর্জন গর্জন শুনে, না বৃদ্ধের শরীরের কাঁপুনি দেখে, বোঝা গেল না। আবার এও হতে পারে, হয়ত তিনি ভেবেছেন, পুলিশকে বাড়ির ভেতরে ডেকে আনা উচিত নয়। হয়ত কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। যাই হোক, যে কোন কারণে নরসিংহম্ ফোন নামিয়ে রেখে, বিড় বিড় করে বললেন, 'ব্যাটাদের ডেকে কি হবে।' বলে তিনি কাপড়টা শক্ত করে বেঁধে নিলেন। বরপ্রসাদ আবার তাকাল ছবির দিকে। এখন ঐ ছবির দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, ওটা যেন খাঁচায় বন্দী বাঘ। বোতলে পোরা ভূত।

বরপ্রসাদ হঠাৎ পা ছড়িয়ে, হেলান দিয়ে সোফার উপর বসল। প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে চিরুণী বের করে বেশ করে চুল আঁচড়ে নিল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিল।

বাইরের বৃষ্টির ছাট ভেতরে ঢুকছিল। বৃষ্টির জলে নরসিংহমের সাধের গালিচা ভিজে যাচ্ছিল।

বোম্মানা বিশ্বনাথম্ সম্পর্কে

শ্রী বোম্মানা বিশ্বনাথম্ আদিতে তেলুগুভাষী, কিন্তু তিনি শুধু বাঙলা লেখেনই না, আধুনিক বাঙলার একজন উল্লেখযোগ্য লেখকরূপেই নিজের স্থান করে নিয়েছেন এবং দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের নানা ভাষা থেকে সযত্নে মণি-মুক্তা আহরণ করে এনে তিনি বঙ্গ-সরস্বতীর অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন। তাঁকে প্রীতি ও সাধুবাদ জানাতে গিয়ে আমরা নিজেদের দৈন্য সম্বন্ধেই সচেতন হই। একই ভারতবর্ষে বাস করেও আমরা একে অন্যকে চিনি না, আর এই অপরিচয়ের দৈন্যই দেখা দেয় আমাদের হিংসা ও গোঁড়ামির বিচিত্র ঘটনাগুলির ভেতর দিয়ে। বিশ্বনাথমের মতো উদার-দৃষ্টি, বহু-ভাষাবিদ্ সাহিত্যিকরাই ভাবী ভারতকে গড়ে তুলবেন এই আশা নিয়েই স্বাগত জানাচ্ছি তাঁকে।

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে জাতীয় ঐক্য এবং অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সাহিত্য একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। প্রতিটি রাজ্যের সাহিত্যশিল্প সম্পর্কে পরস্পরকে সচেতন হতে হবে। আর তার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে ভারতের সুদৃঢ় জাতীয় আদর্শ। এই মহান পটভূমিকায় বোম্মানা বিশ্বনাথম-এর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

অনুবাদক শ্রীবিশ্বনাথম্ বাঙালাভাষী নন; কিন্তু ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের কিছু কিছু অনুবাদ করে পরিচিত হয়েছেন। বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা ভাষায় তিনি একটি ঈর্ষণীয় রচনাভঙ্গী আয়ত্ত করেছেন।

অবাঙালী হয়েও তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ বাঙলায় অনুবাদের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এবং তাঁর প্রত্যেকখানিতে তিনি গভীর সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

To know many languages is undoubtedly an achievement. But it is very difficult for a man of a different country to infuse into another language its own livewire quality.

....The essence of Bengal's literary style he has mastered to perfection. He has been offering distinct service to the Bengali literature by translating stories and poems from other Indian languages. ....Some day he may be the 'Joseph Conrad' of Bengal.

All credit to the translator who writes Bengali with admirable clarity and ease.

বোম্মানা বিশ্বনাথম্, অনূদিত ও রচিত গ্রন্থাবলী

নাটক

প্রতিবাদের একাঙ্ক	৬·০০
তুমি আমায় কম্যুনিষ্ট করেছ	৩·৫০
দুষ্টের দর্পণে/ট্যাক্সমন্ত্রী	২·০০
নাম রেখেছি ঝাঁটা	১·৫০
অগ্নিদীক্ষা	২·০০
সার্কাসের বাঘ/অন্বেষণ	২·০০
অগ্নিশুদ্ধি	২·০০
আজকের ডাক	১·০০
নাটিকা	১·০০
সূচনা	০·৭৫
একটি জীবনকে ঘিরে	২·০০

গল্প সংগ্রহ

এখন যে হাওয়া বইছে	৪·০০
কৃষণ চন্দরের গল্প	৩·০০
কেরালার গল্পগুচ্ছ	২·৫০
অন্ধ্রের গল্পগুচ্ছ	২·০০
একসূত্রে গাঁথা	৩·০০
প্রতিবেশিনী	৪·৫০
ভারতীয় গল্প সঙ্কলন	৪·০০
আধুনিক ভারতের গল্প সঞ্চয়ন	২·০০

কবিতা

আধুনিক ভারতের কবিতা সঞ্চয়ন	২·০০
কবিতা	০·৫০
বিক্ষত ভালবাসা	০·৫০

কিশোর উপন্যাস

বাড়ি-পালিয়ে	১·৭৫

লোক কথা

আমার দেশের লোক কথা	৩·০০
ভারতের রূপকথা (১ম খণ্ড)	১·০০
ভারতের রূপকথা (২য় খণ্ড)	১·০০

উপন্যাস

ঝাড় লণ্ঠন	৬·০০
নারায়ণ রাও	১০·০০
কেরল সিংহম্	৭·৫০
চিংড়ি	৭·০০
দেবদাসী	৪·০০
আম্রপালী	৫·০০
সন্ধ্যারাগ	২·৫০
নায়িকার নাম গীতা	২·৫০
ইন্দুমতী	২·৫০
অশ্রান্ত এক রাগিনী	২·৫০
জেলেনী	২·৫০
রমণী	২·৫০
নায়িকার নাম রীতা	২·৫০
অগ্নিকন্যা	২·০০
নায়িকা	৩·০০
সুরের সানাই বাজুক	২·০০
জানা-অজানা	২·০০
কাঞ্চন্	১·৫০
মঙ্গলা	২·০০
দক্ষিণাবর্তের রাণী	২·৫০
শুধু প্রেম	৩·০০
একটি প্রেমের কাহিনী	২·০০

বিজ্ঞান

চাঁদ আমায় ডাক দিয়েছে	২·০০

সঙ্গীত

বিপ্লবী কবি সুব্বারাও	
পাণিগ্রাহীর সংগীত সংগ্রহ	২·০০

Pocket Dictionary of Lenin's Quotations 1·00